কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

হজ্জ উমরা ও যিয়ারতের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রস্তুতকরণে

দাওয়াত, ইরশাদ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সঙ্গী-সাথীর ওপর। পরকথা:

হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর ফরজ (তথা আবশ্যক) করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ অর্থ: 'আর এ ঘরের হজ্জ মানুষের ওপর আল্লাহর অধিকার- সেসব লোকের জন্য যাদের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার'। [আলে ইমরান: ৯৭] সহীহ বুখারী (৮ নং হাদীস) ও সহীহ মুসলিমে (১৬ নং হাদীস) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল- এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া। সালাত কায়েম করা। যাকাত আদায় করা। বাইতুল্লাহর হজ্জ করা। রমজানের রোযা রাখা'।

সৌদি আরবের দাওয়াত, ইরশাদ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও সতত কামনা হচ্ছে, আল্লাহর পবিত্র ঘর হারামে হজ্জ ও উমরা আদায়কারীগণ, আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মসজিদ যিয়ারতকারীগণ যেন কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী, সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও উম্মাহর উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত নির্দেশিত পথে তাদের ইবাদতগুলো সম্পন্ন করতে পারেন। এই লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে ও সহজভাবে হারামাইনের মেহমানদের সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

সেই পরিকল্পনার জীবন্ত রূপ হলো বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ। যা মূলত আল্লাহর কুরআন, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতামতের আলোকে সুবিন্যস্ত হজ্জ ও উমরা সংশ্লিষ্ট একটি সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশিকা।

আলোচনা সহজ করণার্থে আমরা গ্রন্থটিকে নিম্নলিখিত শিরোনামগুলোতে ভাগ করেছি:
প্রথম অধ্যায়: হজ্জের সংজ্ঞা, বিধান ও এর অস্তিত্বের রহস্য
দ্বিতীয় অধ্যায়: সফর ও সফরের আদবসমূহ
তৃতীয় অধ্যায়: হজ্জের শর্তসমূহ
চতুর্থ অধ্যায়: হজ্জ ও উমরার মীকাতসমূহ
পঞ্চম অধ্যায়: হজ্জের প্রকারসমূহ
ষষ্ঠ অধ্যায়: হজ্জের হাদীর বিবরণ
সপ্তম অধ্যায়: ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ
অষ্টম অধ্যায়: নিষিদ্ধ বিষয়গুলো লঙ্ঘনের ফিদইয়া
নবম অধ্যায়: উমরার বিবরণ
দশম অধ্যায়: হজ্জের রোকন ও ওয়াজিবসমূহ
একাদশ অধ্যায়: হজ্জের বিবরণ
দ্বাদশ অধ্যায়: মসজিদে নববী যিয়ারত

উপরিল্লিখিত বিষয়গুলো দিয়ে সাজানো বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির নাম দেয়া হয়েছে:
'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হজ্জ উমরা ও যিয়ারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ'

প্রথম অধ্যায়: হজ্জের সংজ্ঞা, বিধান ও এর অস্তিত্বের রহস্য

হজ্জের শাব্দিক অর্থ: ইচ্ছা করা।

পরিভাষায় হজ্জ বলা হয়: বিশেষ সময়ে বিশেষ কাজ করার জন্য মক্কা ও 'মাশায়ের' (তথা মীনা, আরাফা ও মুযদালিফাতে) যাওয়ার ইচ্ছা করা।

হজ্জের বিধান: ফরজ হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে একবার হজ্জ পালন করা আবশ্যক। ফলে যে ব্যক্তির মাঝে হজ্জের শর্তগুলো বিদ্যমান থাকবে, প্রতিবন্ধকতাগুলো অবিদ্যমান থাকবে, এতদ্বসত্ত্বেও সে হজ্জ পালনে অনর্থক বিলম্ব করবে, সে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে।

হজ্জ ফরজ হবার প্রমাণ: কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহর আলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হজ্জ ফরজ।

কুরআনে হজ্জের প্রমাণ হলো আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ ﴾ অর্থ: 'আর এ ঘরের হজ্জ মানুষের ওপর আল্লাহর অধিকার- সেসব লোকের জন্য যাদের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার'। [আলে ইমরান: ৯৭]

হাদীসে হজ্জের প্রমাণ হলো আবু হুরাইরা (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, 'হে লোকসকল! তোমাদের ওপর আল্লাহ তাআলা হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ করো'। তখন এক ব্যক্তি বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি প্রতি বছর করতে হবে'? রাসূল নীরব থাকলেন। লোকটি তিনবার একই প্রশ্ন করলো। তৃতীয় বার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'যদি আমি জবাবে 'হ্যাঁ' বলতাম তবে তোমাদের প্রতি বছরই হজ্জ করতে হতো। অথচ তোমরা সেটা করতে পারতে না'। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে যেটুকুতে সীমাবদ্ধ রাখি সেটুকুতেই তোমরা সীমাবদ্ধ থাকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠী এই অতিরিক্ত প্রশ্ন এবং নবীদের নিয়ে মতবিরোধের কারণেই ধ্বংস হয়েছিল। তাই আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করার নির্দেশ দেই সেটা সাধ্যমতো পালন করো। আর যখন কোন কিছু থেকে নিষেধ করি তখন সেটা পরিত্যাগ করো'[১]।

গোটা উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ওয়াজিব[২]।

হজ্জ ফরজ হবার রহস্য: হজ্জ ঠিক সে কারণেই ফরজ করা হয়েছে যে কারণে আল্লাহ গোটা জগতকে সৃষ্টি করেছেন, নবী রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন। আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বিভিন্ন শরীয়ত ও আইন অবতীর্ণ করেছেন। আর তা হলো, আল্লাহর একত্ববাদ বাস্তবায়ন করা এবং কেবল তাঁর জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত সমর্পণ করা। এটা হজ্জের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। কারণ হজ্জের মূল উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর একত্ববাদ বাস্তবায়ন করা। কেবল তাঁর জন্য বন্দেগী করা। তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত না করা। তাই হজ্জের প্রতীক হলো এই ঘোষণা: 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শরীকা লাক'। [অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি উপস্থিত। হে প্রভু আমি হাজির। আমি হাজির আপনার কোন শরীক নেই আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আপনার। রাজত্ব কেবলই আপনার। আপনার কোন শরীক নেই'।]

অতএব সকল জিন ও মানুষের কর্তব্য হলো এক অদ্বিতীয় ও লা শারীক আল্লাহর জন্য ইবাদত করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কোন ধরনের ইবাদত করবে সে আল্লাহর সঙ্গে শরীককারী সাব্যস্ত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ﴾ অর্থ: 'আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি'। [যারিয়াত: ৫৬] আরও বলেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا﴾ অর্থ: 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে সে যেন অপবাদ আরোপ করল'। [নিসা: ৪৮] আরও বলেন, ﴿وَقَالَ ٱلۡمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ

---

(১) সহীহ মুসলিম (১৩৩৭)

(২) অসংখ্য আলিম উক্ত বিধান বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে দেখুন: আল-মাজমূ', নববী (৭/৭)। আল-মুগনী, ইবনে কুদামা (৫/৬)

إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۖ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾
অর্থ: ‘(ঈসা) মাসীহ বললেন, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই’। [মায়িদা: ৭২]

ইবাদত হলো: আল্লাহর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক সকল কথা, সকল বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক কর্মের সমষ্টি। যথা: সালাত, যাকাত, রোযা, হজ্জ, দুআ, আল্লাহর সম্ভ্রম ও ভয়, তাঁর থেকে আশা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, তাঁর ওপর ভরসা, তাঁর কাছে সাহায্য ও জীবিকা প্রার্থনা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সফর ও সফরের আদবসমূহ

সফর শব্দের শাব্দিক অর্থ: দূরত্ব অতিক্রম করা।

শরীয়তের পরিভাষায় সফর হলো, 'সফর পরিমাণ দূরত্ব' অতিক্রমের ইচ্ছা করা। প্রসিদ্ধ মতে, এই দূরত্বের পরিমাণ হলো (প্রাচীন পদ্ধতিতে) ষোলো 'ফারসাখ'। চার 'বারীদ'। মাইলের হিসেবে সেটা আটচল্লিশ মাইল। বর্তমানে যা প্রায় আশি কিলোমিটার। পায়ে হেঁটে কিংবা পশুর পিঠে চরে সাধারণত যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে দুই দিন লাগে। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক দিন ও এক রাতকে 'সফর' হিসেবে অভিহিত করেছেন[১]। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমরের মতো সাহাবাগণ চার 'বারীদ' তথা ষোলো 'ফারসাখ' দূরত্বে সফর করলে সালাত কসর (অর্ধেক) পড়তেন ও রোযা ভাঙতেন[২][৩]।

সফর পার্থিব ও অপার্থিব উভয় উদ্দেশ্যেই হতে পারে।

সফরের বিধান: সফরের বিধান সফরের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত:

ফলে যদি কোনো ওয়াজিব ইবাদতের জন্য সফর করা হয় এমন সফর ওয়াজিব গণ্য হবে। যেমন ফরজ হজ্জের জন্য সফর করা।

সফর যদি কোনো মুস্তাহাব ইবাদতের জন্য করা হয় তবে এমন সফর মুস্তাহাব গণ্য হবে। যেমন উমরা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) মসজিদ যিয়ারতের জন্য সফর করা।

আর যদি সফর কোনো বৈধ কাজের জন্য হয় তবে সফর করা বৈধ গণ্য হবে। যেমন ব্যবসার জন্য সফর করা।

বিপরীতে যদি মাকরূহ কাজের জন্য সফর করা হয় তবে এমন সফরও মাকরূহ হবে। যেমন একাকী সফর করা (মাকরূহ)। হ্যাঁ অনিবার্য পরিস্থিতিতে একাকী সফর করতে হলে সেক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন হবে।

আর যদি কোনো নিষিদ্ধ উদ্দেশ্যে সফর করা হয় তবে এমন সফরও নিষিদ্ধ (হারাম) গণ্য হবে। যেমন আল্লাহর কোনো বিধান ভঙ্গ বা গুনাহের জন্য সফর করা।

হজ্জের সফরের আদবসমূহ:

(১) কেবল আল্লাহর জন্য নিয়ত পরিশুদ্ধ করা। ফলে হজ্জ থেকে শুরু করে গোটা সফরের সকল কথা, কাজ ও আয়-ব্যয়ের পেছনে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

(২) সফরকালে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। যথা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকা। মুস্তাহাবের প্রতি যথাসম্ভব মনোযোগী থাকা। মাকরূহের মতো বিষয়াবলীও বর্জন করা।

(৩) সৎ সঙ্গী গ্রহণের চেষ্টা করা। তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা। সৎ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। সঙ্গীদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বারণ করা। প্রজ্ঞার সঙ্গে উত্তম পন্থায় তাদেরকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করা।

(৪) পরিবার ও স্বজনদেরকে বিদায় জানানো। তাদের জন্য ওসিয়ত লিখে যাওয়া। বিশেষত দেনা-পাওনার বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে যাওয়া।

---

(১) বুখারী (১০৮৮)। মুসলিম (১৩৩৯) (৪২১) আবু হুরাইরা (রা.) এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে নারী আল্লাহ ও পরকাল দিবসে ঈমান রাখে তার জন্য এক দিন ও এক রাতের দূরত্ব মাহরাম ছাড়া সফর করা হালাল নয়'। এটা বুখারীর ভাষ্য। মুসলিমের ভাষ্যে এসেছে, 'যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে তার জন্য মাহরাম পুরুষের তত্ত্বাবধান ছাড়া এক দিন ও এক রাতের সফর করা বৈধ নয়'।

(২) মুয়াত্তা মালেক (১১-১৫)। মুসান্নাফে আব্দির রাযযাক (২/ ৫২৪-৫২৫)। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (২/২০০-২০২)

(৩) বুখারী (২/৪৩)। দেখুন: ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার (২/৫৬৬)

(৫) সর্বোত্তম চরিত্রের ভূষণ গ্রহণের চেষ্টা করা। ফলে সাহায্যপ্রত্যাশীকে সাহায্য করবেন। ইলমপ্রত্যাশীকে ইলম অর্জনে সহায়তা করবেন। দান ও খরচের হাত যথাসম্ভব প্রসারিত রাখবেন। নিজের ও সঙ্গী-সাথীদের প্রয়োজনে উদারহস্তে ব্যয় করবেন।

একইভাবে সফরকালে কর্তব্য হলো সঙ্গী-সাথীদের রূঢ়তা, কঠোর আচরণ, দুর্ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। সফরসঙ্গীদের মাঝে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বহাল রাখার প্রতি সবিশেষ যত্নবান থাকা।

(৬) হজ্জ ও উমরার বিধানগুলো শিখে নেয়া। এসম্পর্কে জানার জন্য কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর, সাহাবা ও তাবেয়ীন, সালাফে সালেহীনের ইমামগণের বক্তব্যের আলোকে রচিত নিরাপদ গ্রন্থগুলো পড়া। বিদআত ও কুসংস্কারপূর্ণ গ্রন্থাবলী থেকে দূরে থাকা। উদাহরণত সেসব গ্রন্থ যা হারামাইন শরীফাইন ও হজ্জের মাশায়ের (তথা আরাফা, মীনা, মুযদালিফা ইত্যাদি স্থান) ব্যতীত বিশেষ কোনো মসজিদ কিংবা কোনো স্থান যিয়ারতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে কিংবা তওয়াফ ও সাঈর সময় বিশেষ কোনো দুআ পড়তে বলে। অথচ এগুলোর কিছুই শরীয়তে প্রমাণিত নয়।

(৭) সফরের সময়, স্থান ও অবস্থাভেদে প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুআ ও যিকিরগুলো পাঠের প্রতি বিশেষ মনোযোগী থাকা। উদাহরণত সফরের শুরুতে সফরের দুআ পাঠ করা। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফরের প্রাক্কালে উটে আরোহণ করতেন, তখন তিনি তিন বার তাকবীর দিতেন। অতঃপর বলতেন, سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هذا البِرَّ والتَّقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المالِ والأهلِ [উচ্চারণ: 'সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফি সাফারিনা হা-যা আল-বিররা ওয়াত তাকওয়া, ওয়া মিনাল আমালি মা তারদা। আল্লাহুম্মা হাওউয়্যিন আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়তয়ি আন্না বু'দাহ। আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিন ওয়াসায়িস সাফারি ওয়া কা-আবাতিল মানজারি, ওয়া সুয়িল মুনকালাব ফিল মালি ওয়াল আহলি'] অর্থ: 'মহাপবিত্র সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এই সফরের কল্যাণ ও তাকওয়া এবং আপনার সন্তোষজনক কাজ করতে পারি সেই প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি এই সফরে আমাদের সাথী আর পেছনে আমাদের পরিবার ও ধন-সম্পদের ওপর আপনি আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য এবং ধন-সম্পদ ও পরিবারের মন্দ পরিণতি থেকে'। আর যখন তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন ওপরের দুআ তিন বার বলে অতঃপর বলতেন, آيِبونَ، تَائِبونَ، عَابِدُون لِرَبِّنَا، حَامِدُونَ [উচ্চারণ: 'আয়িবূনা তায়িবূনা আবিদূনা লিরব্বিনা হামিদূনা'] অর্থ: 'আমরা ফিরে আসছি তাওবাকারী হিসেবে। আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারীরূপে'(১)।

সফরকালের আরেকটি সুন্নাত হচ্ছে, উঁচু স্থানে আরোহণের সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা আর নিম্নস্থানে অবতরণের সময় তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পাঠ করা। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা যখন কোনো উঁচু স্থানে উঠতাম তখন তাকবীর দিতাম। আর যখন নিচের দিকে নামতাম তখন তাসবীহ পাঠ করতাম'(২)।

কোনো স্থানে পৌঁছার পরে এই দুআ পড়া: 'আউযুবি-কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা'। কোনো ব্যক্তি কোথাও পৌঁছার পরে এই দুআ পড়লে সে যতক্ষণ সেখানে থাকবে কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। খাওলা বিনতে হাকীম সুলামিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি কোথাও অবতরণ করে এই দুআ পাঠ করবে, আউযুবি-

(১) সহীহ মুসলিম (১৩৪২)

(২) সহীহ বুখারী (২৩৩৯)

কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা'- সেখানের কোনো কিছু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না'[১]।

(৮) হাজী ও উমরাকারীদের অবশ্য কর্তব্য হলো, হজ্জ ও উমরা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা মেনে চলা। কারণ শাসক বা কর্তৃপক্ষের এসব নির্দেশ পালন মূলত আল্লাহর নির্দেশ পালন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ অর্থ: 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো। রাসূলের আনুগত্য করো। আর তাদের যারা তোমাদের দায়িত্বশীল'। [নিসা: ৫৯] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য (শাসকের নির্দেশ) শোনা ও মানা আবশ্যক। যতক্ষণ না কোনো গুনাহের নির্দেশ দেয়'[২]। উপরন্তু এসব নির্দেশনা পালন স্বয়ং হাজী ও উমরাকারীদের নিজেদের ব্যাপক উপকার লাভ ও ক্ষতি থেকে বাঁচার গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায (র.) বলেন, 'রাষ্ট্র হাজীদের কল্যাণার্থে যেসব আইন ও দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন করে হাজী সাহেবদের জন্য সেগুলো মেনে চলা কর্তব্য। কারণ সৎ কাজে শাসকদের আনুগত্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। আর রাষ্ট্র হাজীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যেসব বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করে সেগুলো সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ গুনাহের কাজ এবং পুণ্য কমে যাবার কারণ'[৩]। বিভিন্ন মহামারীর বিস্তার ঠেকাতে প্রণীত আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধও উপর্যুক্ত নিয়মের আওতাধীন। কারণ এগুলো শরীয়তসিদ্ধ উদ্যোগ। ফলে এগুলো মেনে চলা অপরিহার্য।

---

(১) সহীহ মুসলিম (২৭০৮)

(২) বুখারী (৭১৪৪)। মুসলিম (১৮৩৯)। হাদীসের উপর্যুক্ত ভাষ্য মুসলিম থেকে গৃহীত।

(৩) মাজমূ' ফাতাওয়া ও মাকালাত মুতানাওউয়্যাহ (১৭/ ১৫৫)

তৃতীয় অধ্যায়: হজ্জের শর্তসমূহ

শর্ত শব্দের শাব্দিক অর্থ: চিহ্ন, নিদর্শন, আলামত ইত্যাদি।

পরিভাষায় শর্ত বলা হয়, যা না পাওয়া গেলে সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ও পাওয়া যায় না। তবে যা পাওয়া গেলেই সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু পাওয়া যাবে এমন নয়[১]।

সুতরাং হজ্জের শর্ত বলতে বোঝায়, যা না থাকলে হজ্জ বিশুদ্ধ হয় না। আর হজ্জ শুদ্ধ হবার এমন পাঁচটি শর্ত রয়েছে:

প্রথম শর্ত: ইসলাম। ফলে হাজীর জন্য মুসলমান হওয়া আবশ্যক। কাফিরের ওপর হজ্জ আদায় ওয়াজিব নয়। যদি কোনো কাফির হজ্জ আদায় করে সেটা শুদ্ধও হবে না। কেবল হজ্জ নয়; ইসলামের যাবতীয় ইবাদত শুদ্ধ হবার জন্য মুসলিম হওয়া শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَٰرِهُونَ﴾ অর্থ: 'তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী। তারা সালাতে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে'। [তাওবা: ৫৪]

দ্বিতীয় শর্ত: সুস্থ বিবেক। ফলে অসুস্থ মস্তিষ্ক তথা পাগল বা উন্মাদের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। পাগল যদি হজ্জ আদায় করেন সেটা শুদ্ধ হবে না। কারণ হজ্জ পালনের জন্য নিয়ত ও ইচ্ছা থাকা অনিবার্য। অথচ পাগল ব্যক্তি এগুলো করতে পারেন না। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি; সজাগ হবার আগ পর্যন্ত। নাবালেগ শিশু; বালেগ হবার আগ পর্যন্ত। পাগল; সুস্থ হবার আগ পর্যন্ত'[২]।

তৃতীয় শর্ত: বালেগ হওয়া। ফলে নাবালেগের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। এর দলীল পূর্বে বর্ণিত আয়েশা (রা.) এর হাদীস। যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি; সজাগ হবার আগ পর্যন্ত। নাবালেগ শিশু; বালেগ হবার আগ পর্যন্ত। পাগল; সুস্থ হবার আগ পর্যন্ত'।

তবে এটুকু পার্থক্য যে, নাবালেগের ওপর হজ্জ ফরজ না হলেও যদি কেউ নাবালেগ বয়সে হজ্জ আদায় করে ফেলে তবে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে। এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীস। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাওহা নামক স্থানে একটি কাফেলার সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কারা'? তারা উত্তর দিলো, মুসলমান। আপনি কে? তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ'! তখন এক নারী সঙ্গে থাকা এক শিশুকে উঁচু করে ধরে বললো, এর ওপর কি হজ্জ ফরজ? নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ। তোমারও তাতে পুণ্য হবে'[৩]।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, নাবালেগ শিশু হজ্জ করলে সেটা আদায় হয়ে যাবে। তাতে তার নিজের ও অভিভাবকের পুণ্য হবে। তবে লক্ষণীয় হলো, এতে তার ইসলামের ফরজ হজ্জ আদায় হবে না। ফলে যখন বড় হবে তখন অন্যান্য শর্ত বিদ্যমান থাকলে আবারও হজ্জ করতে হবে। হজ্জে শিশু সঙ্গে থাকলে অভিভাবকের কর্তব্য হলো, বড়দের মতো তাকেও ইহরামের সকল নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে রাখা।

চতুর্থ শর্ত: স্বাধীন হওয়া। ফলে আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে ক্রীতদাসের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। কারণ তার হজ্জ পালনের সামর্থ্য নেই। তবে যদি কোনো ক্রীতদাস হজ্জ সম্পাদন করে সেটা বিশুদ্ধ গণ্য হবে। উপরের মতো এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় হলো, কখনো দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা অর্জিত হলে তখন আবারও ইসলামের হজ্জ আদায় করতে হবে।

---

(১) দেখুন: আত-তাহবীর শরহুত তাহরীর (৩/১০৬৬- ১০৬৭)

(২) মুসনাদে আহমদ (৪১/ ২২৪-২৪৬৯৪)। মুসনাদে দারেমী (২/২২৫)। সুনানে আবী দাউদ (৪৩৯৮)। সুনানে ইবনে মাজাহ (২০৪১)। সুনানে নাসায়ী (৩৪৩২)

(৩) সহীহ মুসলিম (১৩৩৬)। রাওহা হলো মদীনা থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল (তথা ৭৫ কি.মি.) দূরের একটি স্থান। দেখুন: আতিকুল বিলাদী (মু'জামু মাআলিমিল জুগরাফিয়্যাহ: ১৬৪)

পঞ্চম শর্ত: শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতা। ফলে হাজী সাহেবের জন্য হজ্জ আদায়ের লক্ষ্যে মক্কা পর্যন্ত সফরের শারীরিক সক্ষমতা এবং সেখানে গিয়ে হজ্জ পালনে প্রয়োজনীয় সকল খরচ বহনের আর্থিক সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি এই অর্থ তার যাবতীয় মৌলিক খরচ-পাতি, খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক, বিবাহ-শাদী, ঘর-বাড়ি ও ধার-দেনা ইত্যাদির মতো সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে অতিরিক্ত থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ অর্থ: 'আর এ ঘরের হজ্জ মানুষের ওপর আল্লাহর অধিকার- সেসব লোকের জন্য যাদের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার'। [আলে ইমরান: ৯৭] একই কথা বিভিন্ন কাফেলার সঙ্গে হজ্জ করলে। হাজী সাহেবের সেটার খরচ বহনের সামর্থ্য থাকতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তির এমন সামর্থ্য নেই তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়।

মোটকথা কোনো ব্যক্তির আর্থিক সক্ষমতা না থাকলে তার ওপর হজ্জ নেই। একইভাবে কোনো ব্যক্তির আর্থিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি শারীরিক সক্ষমতা না থাকে তবে তার নিজের ওপরও হজ্জ ওয়াজিব নয়। শারীরিকভাবে হজ্জ পালনে অক্ষম ব্যক্তির দু'টো অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: এমন অক্ষমতা যা ভবিষ্যতে প্রতিকারের আশা রয়েছে। যেমন অসুস্থতা যা ভবিষ্যতে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন ব্যক্তি সুস্থতার অপেক্ষা করবেন এবং সুস্থ হবার পরে হজ্জ সম্পন্ন করবেন।

দ্বিতীয় অবস্থা: এমন অক্ষমতা ভবিষ্যতে যা থেকে মুক্তির কোনো আশা নেই। যেমন অতিশয় বার্ধক্য কিংবা দুরারোগ্য কোনো ব্যাধি যা থেকে মুক্তির আশা সুদূর পরাহত। এমন ব্যক্তি কাউকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন এবং প্রতিনিধি তার পক্ষ থেকে (বদলী) হজ্জ আদায় করবে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীসে। তিনি বলেন, খাসআম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ এমন সময় ফরজ হয়েছে যখন আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। বাহনে চড়তে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারবো? নবীজী বললেন, 'হ্যাঁ'। এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা[১]।

শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতার পাশাপাশি নারীর ওপর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার আরও একটি শর্ত রয়েছে। সেটা হলো, মাহরাম সঙ্গী থাকা। সুতরাং মাহরাম পাওয়া না গেলে নারীর ওপর হজ্জ আদায় ওয়াজিব হবে না। কেননা মাহরাম ছাড়া নারীর সফর বৈধ নয়। এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে খুতবার মাঝে বলতে শুনেছি, 'মাহরাম ছাড়া কোনো নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষ যেন নির্জনে মিলিত না হয়। মাহরাম ছাড়া কোনো নারী যেন সফর না করে'। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্জের সফরে বেরিয়ে গেছে। আমি অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি তাই যাইনি। তিনি বললেন, 'দ্রুত চলে যাও। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ করো'[২]।

নারীর সঙ্গে থাকা মাহরামের বালেগ ও সুস্থ বিবেকবান হওয়া জরুরি। সুতরাং শিশু বা পাগল হলে যথেষ্ট হবে না।

নারীর জন্য মাহরাম হলো, স্বামী। আর সেসব পুরুষ যাদের সঙ্গে রক্তসম্পর্ক, দুগ্ধ কিংবা বিবাহসূত্রতার কারণে সেই নারীর বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ থাকে।

হজ্জের সফরের পথ নিরাপদ থাকাও সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যাত্রাপথ অনিরাপদ হলে হজ্জ ওয়াজিব হবে না। একইভাবে মহামারীর বিস্তার কিংবা এ জাতীয় কোনো শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতির শংকা থাকলেও পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটার আগ পর্যন্ত হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

হজ্জের অনুমতি (লাইসেন্স/পারমিট সম্পর্কিত) মাসআলা:

হজ্জ পালনের পবিত্র স্থানগুলোর আয়তন সীমিত। সেগুলোতে প্রতি বছর হজ্জ প্রত্যাশী সকল মুসলমানদের স্থান সংকুলিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। এই বাস্তবতা মাথায় রেখে হাজীদের সংখ্যায় শৃঙ্খলা আনা আবশ্যক যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে নিরাপত্তার সঙ্গে হজ্জ সম্পন্ন করতে পারেন। অত্যধিক ভিড়ের কারণে হাজীরা বিশেষত আল্লাহর ঘরের বয়োবৃদ্ধ মেহমানরা যেন বিপদের মুখে না পড়েন। এই মহতি লক্ষ বাস্তবায়নের জন্যই সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত হাজীদের সংখ্যা সীমিতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। যাতে প্রত্যেক হাজী

---

(১) বুখারী (১৫১৩)। মুসলিম (১৩৩৪)

(২) বুখারী (৩০০৬)। মুসলিম (১৩৪১)

পাঁচ বছর অন্তর একবার হজ্জ করার সুযোগ পান। সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের পক্ষ থেকে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বৈধতার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। ফলে এখন সে অনুযায়ীই প্রতি বছর হাজীদের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। হজ্জ করতে ইচ্ছুক সকলের উক্ত নীতিমালা মেনে চলা আবশ্যক। এই নিয়মের ব্যত্যয় গুনাহের কারণ।

হজ্জের অন্যান্য শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকার পরেও কোনো ব্যক্তি যদি নিজ দেশের জন্য নির্ধারিত কোটা পূর্ণ হওয়া কিংবা অন্য কোনো কারণে একান্ত সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকার পরেও হজ্জের অনুমতি না পান, তবে তিনি মাযূর গণ্য হবেন। নির্ধারিত নিয়মে অনুমতি পাবার আগ পর্যন্ত তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়: হজ্জ ও উমরার মীকাতসমূহ

আরবি শব্দ **'মীকাত' এর বহুবচন 'মাওয়াকীত'।** এর শাব্দিক অর্থ, কোনো কাজের সময় বা স্থান।

'মীকাত' দুই ধরনের হয়ে থাকে: সময় সংশ্লিষ্ট ও স্থান সংশ্লিষ্ট:

সময়সংশ্লিষ্ট মীকাতসমূহ: উমরার জন্য শরীয়তে কোনো নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা সময় নেই। ফলে বছরের যে কোনো সময়, রাত ও দিনের যে কোনো মুহূর্তে উমরা করা যেতে পারে। কোনো মুসলমান যখনই চান সবকিছু ঠিক থাকলে তিনি উমরা আদায় করতে পারেন।

তবে হজ্জ নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমনটা আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেছেন, ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ অর্থ: 'হজ্জের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ্জ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজ্জে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়'। [বাকারা: ১৯৭] ইবনে উমর (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'হজ্জের মাসগুলো হলো: শাওয়াল, যুল কা'দাহ ও যুল-হজ্জের দশ দিন'[১]।

উক্ত নীতিতে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে হজ্জ সংঘটিত হবে না। ফলে কোনো মুসলমান যদি রমজান মাসে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধেন তার ইহরাম বিশুদ্ধ হবে না। কারণ তখন হজ্জের সময় নয়। সেটা উমরার ইহরাম গণ্য হবে। একইভাবে কুরবানীর দিন সূর্যোদয়ের পর থেকেও হজ্জের ইহরাম বিশুদ্ধ হবে না।

স্থানসংশ্লিষ্ট মীকাতসমূহ: এগুলো শরীয়ত নির্ধারিত কিছু স্থান যেখান থেকে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে হয়। মোট পাঁচটি স্থানকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীকাত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনাবাসীদের জন্য যুলহুলাইফাকে, শামবাসীদের জন্য 'জুহফা'কে, নজদবাসীদের জন্য 'ক্বরনুল মানাযিল'কে, ইয়েমেনবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'কে মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এগুলো সেসব দেশের অধিবাসীদের কিংবা সেদিক থেকে হজ্জ ও উমরার জন্য আগত লোকদের মীকাত গণ্য হবে। আর যারা এসব অঞ্চলের ভেতরে থাকবে তারা নিজস্ব স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। একইভাবে মক্কাবাসীরা মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে[২]।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইরক'কে মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন[৩]।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন এই দু'টো শহর (তথা ইরাকের কুফা ও বসরা) বিজিত হলো তখন সেখানের অধিবাসীরা উমর (রা.) এর কাছে এসে বললো, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নজদবাসীদের জন্য 'ক্বরনুল মানাযিল'কে মীকাত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সেটা আমাদের পথ থেকে ভিন্ন দিকে। আমরা যদি 'ক্বরন' এর পথে যাই তবে আমাদের জন্য সেটা কঠিন হবে। উমর (রা.) বললেন, তাহলে সেই বরাবর কোনো একটা স্থানের ব্যাপারে আমাকে জানাও। অতঃপর তিনি তাদের জন্য 'যাতু ইরক' কে নির্ধারণ করে দিলেন[৪]।

ফলে আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে মীকাতের সংখ্যা পাঁচটি। নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হলো:

---

(১) সহীহ বুখারী (১/৪৮১; ইমাম বুখারী এটা সনদহীনভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন)। সাঈদ ইবনে মানসূর এটাকে নিরবচ্ছিন্ন সনদসহ বর্ণনা করেছেন (৩/৭৮৭)। ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে এটাকে সহীহ বলেছেন (১/৫৪২)। ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজারও সহীহ বলেছেন (৩/৪২০)

(২) বুখারী (১৫২৬)। মুসলিম (১১৮১)

(৩) আবু দাউদ (১৭৩৯)। নাসায়ী (২৬৫৩)

(৪) বুখারী (১৫৩১)

প্রথম মীকাত: যুল হুলাইফা: এটা 'আবইয়ারে আলী' নামেও পরিচিত। মদীনাবাসী ও তাদের পথে আগতদের মীকাত। এটা মক্কার সবচেয়ে দূরবর্তী মীকাত। মক্কা থেকে ৪৩৫ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত[১]।

দ্বিতীয় মীকাত: জুহফা: এটা শামের অধিবাসী ও সে পথে আগত অন্যান্যদের মীকাত। মক্কা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ১৬৭ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

তৃতীয় মীকাত: ক্বরনুল মানাযিল। বর্তমান সময়ে এটা 'আস-সাইলুল কাবীর' নামে পরিচিত। এটা নজদবাসী ও এই পথে আগত সবার জন্য নির্ধারিত মীকাত। এটা মক্কার সবচেয়ে কাছাকাছি মীকাতও বটে। মক্কার পূর্ব দিকে মাত্র ৭৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

ক্বরনুল মানাযিল মীকাত বরাবর একটি মীকাত হলো 'ওয়াদী মাহরাম'। এটা মূলত (তায়েফের) 'হাদা' অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ক্বরনুল মানাযিল উপত্যকার সর্বোচ্চ অংশে অবস্থিত। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ৬৭ কি.মি.।

চতুর্থ মীকাত: ইয়ালামলাম: এটার নতুন নাম 'আস-সা'দিয়্যাহ'। এটা ইয়েমেন ও সে পথে আগতদের মীকাত। মক্কা থেকে দক্ষিণ দিকে ১০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

পঞ্চম মীকাত: যাতু ইরক: এটার বর্তমান নাম 'আয-যরীবাহ'। এটা ইরাকবাসী ও সেদিক থেকে আগত লোকদের জন্য নির্ধারিত মীকাত। মক্কা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ১০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

যেসব মানুষ এসব মীকাত দিয়ে অতিক্রমকারী পথের পরিবর্তে অন্য কোনো পথ দিয়ে আসবেন, তারা তাদের সবচেয়ে কাছাকাছি দূরত্বে বিদ্যমান মীকাত বরাবর পৌঁছে গেলে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবেন।

মীকাত সীমার ভেতরে হারামের বাইরে বসবাসকারী লোকদের মীকাত: যেসব মানুষ এসব মীকাতের সীমার ভেতরে (কিন্তু হারাম সীমারেখার বাইরে) বসবাস করেন, তাদের বসবাসস্থলই তাদের জন্য মীকাত। সেখান থেকে তারা ইহরাম বাঁধবেন। উদাহরণত জেদ্দা, বাহরা, শারায়ে' অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলো মীকাত সীমার ভেতরে কিন্তু হারামের সীমারেখার বাইরে মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত।

মক্কাবাসীদের মীকাত: হজ্জের ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের মীকাত নিজস্ব বসবাসের স্থান। ফলে তারা তাদের ঘর থেকে ইহরাম বাঁধবেন। কিন্তু উমরার জন্য তাদেরকে হারাম সীমার বাইরে বের হয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে। এর প্রমাণ আয়েশা (রা.) এর প্রতি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনা। মক্কায় থাকা অবস্থায় উমরা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হারামের বাইরে থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) কে ডেকে বলেন, 'তোমার বোনকে নিয়ে হারামের বাইরে চলে যাও। অতঃপর সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে এখানে আসো। তোমরা আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো'[২]।

হজ্জ ও উমরার নিয়তে যারা (মক্কা) আসবেন, ইহরাম ব্যতীত তাদের জন্য এসব স্থান অতিক্রম করা বৈধ নয়।

বিমানযাত্রীদের জন্য সতর্কবার্তা: যারা হজ্জ ও উমরার নিয়তে উড়োজাহাজ যোগে আসবেন এসব স্থান বরাবর উড়োজাহাজ অতিক্রম করার সময় তাদের জন্য ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। ফলে উড়োজাহাজ মীকাত বরাবর উচ্চতায় আসার আগেই তারা ইহরামের কাপড় পরে প্রস্তুত থাকবেন। বরাবর এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ইহরামের নিয়ত করবেন। আর যদি ঘুম কিংবা উড়োজাহাজের ক্রুদের ঘোষণা না দেয়ার আশংকা থাকে তবে সেক্ষেত্রে মীকাত বরাবর আসার আগেও ইহরামের নিয়ত করা বৈধ হবে।

তাই ইচ্ছাকৃতভাবে উড়োজাহাজ জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ পর্যন্ত ইহরাম বাঁধতে দেরি করবেন না। কারণ এটা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশের লঙ্ঘন। ফলে তা হারাম বিবেচিত হবে।

হজ্জ কিংবা উমরার নিয়তসহ আসা কোনো ব্যক্তি যদি ইহরাম ব্যতীত মীকাতের জায়গাগুলো অতিক্রম করেন তবে তার জন্য পেছনে ফিরে এসে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক। আর যদি কেউ ফিরে না এসে পথিমধ্যে কিংবা মক্কায় পৌঁছে ইহরাম বাঁধেন তবে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য বিবেচিত হবেন। আল্লাহর

---

(১) মক্কা মুকাররমা ও এসব মীকাতের মাঝের দূরত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: ড. বদরুদ্দীন ইউসুফ মুহাম্মাদ আহমদ কৃত 'মাওয়াকীতুল হজ্জ আল-মাকানিয়্যাহ; দিরাসাতুন ফিল জুগরাফিয়া ওয়া মাফহূমিল মুহাযাহ'।

(২) বুখারী (১৫৬০)। মুসলিম (১২১১)

আইন ও সীমারেখা লঙ্ঘনকারী গণ্য হবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾ অর্থ: ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে সে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবে’। [আহযাব: ৩৬] আরও বলেন, ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ অর্থ: ‘আর যারা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালেম’। [বাকারা: ২২৯] উক্ত অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাকে ‘দম’ তথা পশু কুরবানি দিতে হবে। অর্থাৎ তিনি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একটি ছাগল জবাই করে মক্কার দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিবেন। পাশাপাশি এমন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হবার কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবেন এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ পুনরায় না করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবেন।

পঞ্চম অধ্যায়: হজ্জের প্রকারসমূহ

হজ্জ সর্বমোট তিন প্রকারের:

প্রথম প্রকার: তামাত্তু':

তামাত্তু' (অর্জন, লাভ, উপভোগ) এর অর্থ হলো, হজ্জের সঙ্গে উমরা করার সুবিধা অর্জন। তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি হজ্জের মাসগুলোতে প্রথমে স্রেফ উমরার নিয়ত করবেন। অতঃপর তওয়াফ, সাঈ ও চুল কাটার মাধ্যমে উমরা সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাবেন। আল্লাহর হালালকৃত বিষয়গুলোর যা খুশি গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ তার জন্য তখন ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়াবলী প্রযোজ্য হবে না। কারণ তিনি ইতোমধ্যে উমরা থেকে হালাল হয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি নিজস্ব অঞ্চলে ফিরে যাবেন না (মক্কায় থাকবেন)। যখন হজ্জের সময় আসবে তখন হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন।

আর যদি কেউ শাওয়াল মাসের আগেই উমরার ইহরাম বাঁধেন অতঃপর মক্কায় থেকে গিয়ে হজ্জ করেন তবুও তিনি তামাত্তু' আদায়কারী গণ্য হবেন না। কারণ তিনি হজ্জের মাস আসার আগেই ইহরাম বেঁধে ফেলেছেন।

একইভাবে কেউ যদি শাওয়াল মাসে উমরার ইহরাম বাঁধেন অতঃপর পরের বছর হজ্জ করেন তবে তিনিও তামাত্তু' আদায়কারী গণ্য হবেন না। কারণ তার উমরা হয়েছে এক বছরে আর হজ্জ হয়েছে আরেক বছরে।

একইভাবে কেউ যদি হজ্জের মাসগুলোতে উমরার ইহরাম বাঁধেন অতঃপর উমরা শেষ করে নিজ এলাকায় ফিরে যান। এরপর হজ্জের ইহরাম বেঁধে আবারও মক্কায় আসেন, তিনিও তামাত্তু' আদায়কারী গণ্য হবেন না। কারণ তিনি স্বতন্ত্র হজ্জের জন্য এসেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার: ক্বিরান

ক্বিরান (মিলন, সংযোগ) এর অর্থ হলো- হজ্জ ও উমরা একত্রে মিলিয়ে আদায় করা। অর্থাৎ তিনি মীকাত থেকে উমরা ও হজ্জ দু'টোরই ইহরাম বাঁধবেন। অথবা প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবেন অতঃপর উমরার তওয়াফ শুরুর আগে তাতে হজ্জের নিয়ত যুক্ত করবেন। ফলে মক্কায় পৌঁছে সর্বপ্রথম তওয়াফে কুদূম (আগমনী তওয়াফক) করবেন। এটা সুন্নাত। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য একটি সাঈ (সাত বার) সম্পন্ন করবেন। এটা রোকন। অতঃপর মুহরিম অবস্থায় থাকবেন এবং ঈদের দিন হালাল হবেন।

ক্বিরান হজ্জ আদায়কারী চাইলে তওয়াফে কুদূমের পরে সাঈ নাও করতে পারেন। বরং তিনি হজ্জের তওয়াফ শেষে সাঈ করতে পারেন। বিশেষত যদি মক্কায় পৌঁছতে দেরি হয় এবং সাঈ করতে গেলে হজ্জের সময় ফুরিয়ে যাবার আশংকা থাকে তবে তিনি পরে সাঈ করবেন।

তৃতীয় প্রকার: ইফরাদ

ইফরাদ (স্বতন্ত্রকরণ, আলাদাকরণ) অর্থ শুধু হজ্জ করা। হজ্জের সঙ্গে উমরা সংযুক্ত না করা। ফলে তিনি যখন মক্কায় পৌঁছবেন তখন তওয়াফে কুদূম (আগমনী তওয়াফ) করবেন। অতঃপর হজ্জের জন্য সাঈ করবেন। এরপর ইহরাম অবস্থায় থাকবেন অতঃপর ঈদের দিন হালাল হবেন।

হজ্জে ইফরাদ আদায়কারী ব্যক্তি চাইলে 'ক্বিরান' হজ্জ আদায়কারীর মতো সাঈ হজ্জের মূল তওয়াফের পরেও করতে পারেন।

উক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হলো যে, হজ্জে ক্বিরান ও ইফরাদ আদায়কারীর কাজ প্রায় অভিন্ন। স্রেফ নিয়তের পার্থক্য। আর এটুকু পার্থক্য যে, ক্বিরান আদায়কারীকে 'হাদী' তথা পশু কুরবানী করতে হবে। কারণ তিনি একই সঙ্গে দু'টো ইবাদত করেছেন। বিপরীতে হজ্জে ইফরাদ আদায়কারীকে পশু কুরবানী করতে হবে না।

হজ্জের সর্বোত্তম প্রকার:

হজ্জের সর্বোত্তম প্রকার হলো: তামাত্তু' তথা প্রথমে উমরা করে হালাল হয়ে অতঃপর হজ্জ করা। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদেরকে এটা করতে বলেছেন ও এটার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। বরং তামাত্তু' আদায়ের জন্য তিনি তাদের হজ্জের নিয়তকে উমরার নিয়তে বদলাতে বলেছেন।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যুলকা'দের পঁচিশ তারিখ রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে মদীনা থেকে বের হই। আমরা জানতাম, কেবল হজ্জ করতে যাচ্ছি। কিন্তু যখন আমরা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই মর্মে নির্দেশ দেন, 'যার কাছে হাদী (কুরবানীর পশু) নেই সে যেন বাইতুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ শেষ করে হালাল হয়ে যায়'(১)।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'যদি আমি আগে জানতাম যা আমি পরে জেনেছি তবে আমি 'হাদী' নিয়ে আসতাম না। বরং আমি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতাম। সুতরাং তোমাদের যার যার কাছে হাদী নেই সে যেন হালাল হয়ে যায় এবং উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে'(২)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমরা জানো আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি। সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী ও সবচেয়ে বেশি পুণ্যে অগ্রগামী। যদি আমার সঙ্গে 'হাদী' না থাকতো তবে আমিও হালাল হয়ে যেতাম যেমনটা তোমরা হচ্ছো। যদি আমি আগ জানতাম এখন যা জেনেছি তবে আমি হাদী নিয়ে আসতাম না'। তখন সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহর নির্দেশের আনুগত্যস্বরূপ হালাল হয়ে গেলেন'(৩)।

ওপরের হাদীসদু'টো হজ্জের প্রকারত্রয়ের মাঝে তামাত্তু' শ্রেষ্ঠ হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তবে যদি সঙ্গে 'হাদী' থাকে সেক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন। এমন ব্যক্তির জন্য 'ক্বিরান' হজ্জ উত্তম যেমনটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন।

উপরন্তু তামাত্তু' হজ্জ সবচেয়ে সহজ হজ্জ। কারণ এক্ষেত্রে হাজী হজ্জ ও উমরার মাঝে হালাল হবার সুযোগ লাভ করে থাকেন।

---

(১) বুখারী (১৭০৯)। মুসলিম (১২১১; ১২৫)

(২) বুখারী (১৬৫১)। মুসলিম (১২১৮; ১৪৭)

(৩) বুখারী (৭৩৬৭)

ষষ্ঠ অধ্যায়: হজ্জের হাদীর বিবরণ

হাদী (পশু কুরবানী) কেবল তাম্মাতু' ও ক্বিরান হজ্জে ওয়াজিব। ইফরাদ হজ্জে পশু কুরবানী ওয়াজিব নয়।

আবার তামাত্তু' ও ক্বিরান হজ্জেও পশু কুরবানী ওয়াজিব হবে বহিরাগতদের জন্য। অর্থাৎ মসজিদে হারামের অধিবাসী নন এমন হাজীরা কেবল পশু কুরবানী করবেন। বিপরীতে যারা হারামের অধিবাসী তাদের ওপর হাদী বা পশু কুরবানী ওয়াজিব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۗ﴾ অর্থ: 'এই বিধান তার জন্য যার পরিবার মসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়'। [বাকারা: ১৯৬]

ফলে যারা মক্কার অধিবাসী নন তাদের মাঝে যারা হজ্জে ক্বিরান কিংবা তামাত্তু' আদায় করতে চান তাদের প্রত্যেককে হাদী তথা পশু কুরবানী করতে হবে। এমনকি মক্কার আশপাশ তথা জেদ্দার লোকদেরকেও পশু কুরবানী করতে হবে। কারণ তারা মক্কা শহরের অধিবাসী গণ্য নন।

যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, কেউ তামাত্তু' কিংবা ক্বিরান হজ্জ করে ফেললেন কিন্তু তার কাছে নিজস্ব খরচ ও ফেরার অর্থ বাদে পশু কেনার অতিরিক্ত টাকা নেই, তবে এমন ব্যক্তির ওপর থেকে পশু কেনার বিধান রহিত হয়ে যাবে। এর পরিবর্তে তাকে দশ দিন রোযা রাখতে হবে। তিন দিন হজ্জের মাঝে। আর সাত দিন বাড়িতে ফেরার পরে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ﴾ অর্থ: 'অতপর যে ব্যক্তি উমরার পর হজ্জ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু' করবে, সে যে পশু সহজ হবে (তা যবেহ করবে)। কিন্তু যে তা পাবে না সে হজ্জে তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে তখন সাত দিন রোযা পালন করবে। এই হলো পূর্ণ দশ দিন'। [বাকারা: ১৯৬]

উক্ত ব্যক্তি চাইলে আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিন তথা যুলহজ্জের এগারো, বারো ও তেরো তারিখে রোযা পালন করতে পারেন। এর প্রমাণ আয়েশা ও ইবনে উমর (রা.) এর বক্তব্য: 'আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা রাখার অনুমতি নেই। তবে সে ব্যক্তির জন্য অনুমতি রয়েছে যার কাছে হাদী নেই'(১)।

তবে উত্তম হলো ঈদের দিনের আগেই মুহরিম থাকা অবস্থায় এই তিনটি রোযা রেখে ফেলা। ঈদের দিন রোযা রাখা বৈধ নয়। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'টো দিন- তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন'(২)।

এই তিনটি রোযা একটানা রাখা যাবে আবার আলাদা করেও রাখা যাবে। তবে বিশেষ কোনো উজর না থাকলে আইয়্যামে তাশরীকের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা যাবে না বরং আগেই রেখে ফেলা উত্তম। আর যদি কোনো কারণে দেরি হয়ে যায় তবে তখন রাখবেন। আর বাকি সাতটি বাড়িতে ফিরে একত্রে বা আলাদা যেভাবে খুশি সেভাবে রাখবেন। কারণ আল্লাহ তাআলা এসব রোযা স্বাভাবিকভাবে রাখতে বলেছেন। একত্রে রাখার শর্ত দেননি।

হাদীর বিবরণ:

হাদী চতুষ্পদ জন্তু হওয়া আবশ্যক। যথা: উট, গরু, ছাগল বা ভেড়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ﴾ অর্থ: 'এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও'। [হজ্জ: ২৮]

এক ব্যক্তির জন্য হাদী হিসেবে একটি ছাগল জবাই করতে হবে।

আর উট বা গরুতে সাত ব্যক্তি পর্যন্ত শরীক হতে পারবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে বের হলাম। আল্লাহর রাসূল

---

(১) বুখারী (১৯৯৭)

(২) বুখারী (১৯৯১)। মুসলিম (১১৩৮; ১৪১)

আমাদেরকে উট ও গরুতে শরীক হবার নির্দেশ দিলেন। ফলে আমাদের প্রত্যেক সাত জন একটি উটে শরীক হলো'[১]।

হাদী যতো পবিত্র হবে ততো উত্তম। কারণ আল্লাহ পবিত্র ফলে তিনি কেবল পবিত্রটাই গ্রহণ করেন। জবাইয়ের ক্ষেত্রে হাদী হারামের সীমার ভেতরে যে কোনো স্থানে জবাই করা বৈধ। বর্তমানে সৌদি সরকার নির্মিত পশু জবাইয়ের নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে ফলে সেখানেই এটা সম্পন্ন করা উচিত।

যদি কেউ হারাম সীমার বাইরে গিয়ে পশু জবাই করে তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের বক্তব্য মতে, তার হাদী আদায় হবে না।

তামাত্তু' ও ক্বিরান হজ্জের হাদী নির্দিষ্ট সময়ে জবাই করা আবশ্যক। সেটা হলো জবাইয়ের দিনগুলো তথা ঈদের দিন ঈদের সালাতের পর থেকে ঈদের পরের তিন দিন। ঈদের দিনের আগে হাদী জবাই বৈধ নয়। একইভাবে তাশরীকের দিনগুলোর পর পর্যন্ত বিলম্ব করাও বৈধ নয়। কারণ তখন জবাইয়ের দিন শেষ হয়ে যাবে। সে সময় জবাই করলে যথেষ্ট হবে না।

উট 'নাহর' তথা কুরবানী করার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হলো, বাম হাত বেঁধে দণ্ডায়মান অবস্থায় কুরবানী করা। যদি দণ্ডায়মান অবস্থায় না করা যায় তবে বসিয়ে করতে হবে। আর উট ব্যতীত অন্যান্য পশু কুরবানীর সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হলো মাটিতে কাত করে শুইয়ে জবাই করা।

উট 'নাহর' বা অন্যান্য পশু কুরবানীর সময় জবাইকারীর 'বিসমিল্লাহ' বলা আবশ্যক। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' না বলে তবে সেই পশুর মাংস খাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ﴾ অর্থ: 'যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এগুলো ভক্ষণ করা গোনাহ'। [আনআম: ১২১] সেই পশু জবাই হাদী হিসেবেও গণ্য হবে না। কারণ সেটা মারা গেছে, জবাই হয়নি। হ্যাঁ যদি বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তখন মাযূর গণ্য হবে এবং এমন পশুর মাংস খাওয়া যাবে। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি বিস্মৃত হয়ে যাই বা ভুল করি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না'। [বাকারা: ২৮৬]

হাদীর মাংসের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো নিজে খাওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানো।

---

(১) মুসলিম (১৩১৮; ৩৫১)

সপ্তম অধ্যায়: ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

'নিষিদ্ধ বিষয়' বলতে এমন সব কাজকে বোঝানো হয়, ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য যেগুলোতে লিপ্ত হওয়া হারাম। এগুলো সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে:

প্রথম প্রকার: নারী-পুরুষ সবার জন্য নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় প্রকার: কেবল পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ।

তৃতীয় প্রকার: কেবল নারীর জন্য নিষিদ্ধ।

এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রথম প্রকার: নারী-পুরুষ সবার জন্য নিষিদ্ধ:

১- শরীরের যে কোনো জায়গার লোম কাটা বা মুণ্ডানো। বিশেষ কোনো উজর ছাড়া এমন করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ অর্থ: 'আর কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না'। [বাকারা: ১৯৬] কুরআনে কেবল মাথা মুণ্ডন নিষেধ করা হয়েছে। হাত-পাসহ শরীরের অন্যান্য অংশের লোম চুলের বিধানে পরিগণিত ফলে সেগুলোও নিষিদ্ধ হবে।

২- নখ কাটা, ছোট করা, সুন্দর করা ইত্যাদি। কেননা এটাও শরীরের অংশ এবং এর মাধ্যমে সৌন্দর্য বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ফলে এটা চুলের বিধানের আওতায় পড়বে। হাত ও পায়ের নখের বিধান অভিন্ন। দু'টোই নিষিদ্ধ। হ্যাঁ যদি নখের কোনো অংশ ভেঙে গিয়ে ব্যথা সৃষ্টি হয় তবে ব্যথা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ কাটা যাবে।

৩- ইহরামের পরে সুগন্ধি ব্যবহার করা। ফলে শরীর, পোশাক, খাবার, পানীয় কোথাও সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। এর প্রমাণ ইবনে উমর (রা.) এর হাদীস। যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহরিম ব্যক্তির পোশাক সম্পর্কে বলেন, 'জাফরান কিংবা ওয়ারস (হলুদ জাতীয়) মিশ্রিত পোশাক পরবে না'[১]। একইভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মুহরিম ব্যক্তি উটের পিঠ থেকে পড়ে মরে গেলো। তাকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন, 'তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাও। মাথা ঢেকো না। সুগন্ধি দিও না। কারণ সে মুহরিম অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে'[২]।

ইহরাম অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়া কিংবা কফির স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধির জন্য তাতে জাফরান মিশ্রিত করা, অথবা চায়ের স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধির জন্য তাতে গোলাপজল ইত্যাদি সংযুক্ত করা বৈধ নয়।

সুগন্ধিকাঠ (ঊদ), মেশক, জুঁই এসবের গন্ধ সমৃদ্ধ সাবান, শ্যাম্পু, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদিও ব্যবহার করবেন না। হ্যাঁ যদি এগুলো সুগন্ধিশূন্য হয় কিংবা তাতে সুগন্ধির পরিবর্তে লেবু, পুদিনা ইত্যাদির মতো সাধারণ ঘ্রাণ ব্যবহার করা হয় তবে অসুবিধা নেই।

ইহরামের পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধি যদি ইহরাম বাঁধার পরেও অবশিষ্ট থাকে তাতে সমস্যা নেই। কারণ ইহরাম অবস্থায় নতুন করে সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ; আগের ব্যবহৃত সুগন্ধির সুবাস থাকা নিষিদ্ধ নয়। এটার প্রমাণ আয়েশা (রা.) এর বক্তব্য। তিনি বলেন, 'আমি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহর সিঁথিতে (পূর্বের) ব্যবহৃত সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি'[৩]।

---

(১) বুখারী (৫৮০৩)। মুসলিম (১১৭৭)

(২) বুখারী (১৮৩৯)। মুসলিম (১২০৬; ৯৯)

(৩) বুখারী (২৭১)। মুসলিম (১১৯০; ৩৯)

৪- বিবাহের আকদ করা। এর প্রমাণ উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না। বিবাহ বসবে না। বিবাহের প্রস্তাব দিবে না'(১)।

সুতরাং মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোনো নারীকে বিবাহ করা কিংবা কোনো নারীর উকীল বা ওলী হয়ে আকদ করা বৈধ নয়। ইহরাম শেষ না করে কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়াও বৈধ নয়। ইহরাম অবস্থায় থাকা কোনো নারীকে বিবাহ করাও বৈধ নয়। বরং ইহরাম অবস্থায় যদি কেউ বিয়ে করে ফেলে সেটা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা হাদীসের নিষেধাজ্ঞা 'হারাম' প্রমাণ করে। ফলে এই ধরনের বিবাহ 'নষ্ট' গণ্য হবে।

৫- কামবাসনা ও উত্তেজনাসহ পরস্পরকে চুম্বন করা, স্পর্শ করা কিংবা বুকে লাগানো। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ﴾ অর্থ: 'হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হওয়া (রাফাস) জায়েজ নয়। না অশোভন কোন কাজ করা জায়েজ। না ঝাগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েজ'। [বাকারা: ১৯৭] আয়াতে বর্ণিত 'রাফাস' শব্দের অর্থ যৌনমিলন। এতে মিলনের পূর্বে ঘটিত সকল কাজ তথা চুম্বন, চোখের ইশারা, আমোদ-প্রমোদ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত হবে।

ফলে ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীকে যৌন উত্তেজনাসহ চুম্বন করা, স্পর্শ করা কিংবা চোখে যৌন ইশারা দেয়া এবং এসম্পর্কিত প্রমোদ করা বৈধ নয়। কামবাসনাসহ তাকানোও বৈধ নয়। কারণ সেটাও সহবাস সদৃশ ও পথ উন্মুক্তকারী।

ইহরাম অবস্থায় থাকা স্ত্রীর জন্যও স্বামীকে এমন কোনো সুযোগ প্রদান করা হালাল নয়।

৬- যৌনমিলন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ﴾ অর্থ: 'হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়। না অশোভন কোন কাজ করা জায়েজ। না ঝগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েজ'। [বাকারা: ১৯৭] এখানে 'রাফাস' বলতে মিলন উদ্দেশ্য।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলীর মাঝে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ হচ্ছে যৌনমিলন। হজ্জের ওপর এটা মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দু'টো অবস্থা বিবেচনায় এটাকে ব্যাখ্যা করা যায়:

প্রথম অবস্থা: ইহরাম থেকে প্রাথমিকভাবে হালাল হওয়ার আগেই যৌনমিলন করা। এমন ব্যক্তিদের দু'টো শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে:

ক. ফিদইয়া দিতে হবে। সাহাবাদের সর্বসম্মতিক্রমে এটা কুরবানীর উপযুক্ত উট বা গরু। এমন পশু জবাই করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। নিজে কিছু খেতে পারবে না।

খ. সংশ্লিষ্ট হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে। তথাপি সেটা পূর্ণ করতে হবে (মাঝপথে চলে যেতে পারবে না)। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ﴾ অর্থ: 'তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরাকে পূর্ণ করো'। [বাকারা: ১৯৬] অতঃপর এই হজ্জকে পরবর্তী বছর কিংবা যখনই সামর্থ্য হবে কোনোরূপ বিলম্ব ব্যতীত কাজা আদায় করতে হবে। এব্যাপারে সকল সাহাবা ও আলিমগণ একমত।

দ্বিতীয় অবস্থা: ইহরাম থেকে প্রাথমিকভাবে হালাল হওয়ার পরে যৌনমিলন করা। অর্থাৎ যদি কেউ (জামরায়ে আকাবা তথা সর্ববৃহৎ জামরাতে পাথর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছোট করা, এবং তওয়াফে ইফাজা-) এই তিনটি কাজের মাঝে যে কোনো দু'টো কাজ করার পরে যৌনমিলন করে তার হজ্জ বিশুদ্ধ গণ্য হবে। তথাপি তাকে ফিদইয়া হিসেবে একটি ছাগল জবাই করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। নিজে সেখান থেকে কিছু খেতে পারবে না।

কেবল যৌন মিলন দ্বারাই হজ্জ নষ্ট হয়ে যায়। এটা ছাড়া ইহরাম অবস্থায় অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে হজ্জ নষ্ট হয় না।

---

(১) মুসলিম (১৪০৯; ৪১)

৭- শিকারে লিপ্ত হওয়া। এখানে শিকার বলতে সেসব হালাল স্থলজ বন্য প্রাণী শিকার উদ্দেশ্য যা প্রাকৃতিকভাবে গৃহপালিত নয় যথা হরিণ, খরগোশ ও কবুতর ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ অর্থ: 'তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না'। [মায়িদা: ১] আরও বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ অর্থ: 'মুমিনগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না'। [মায়িদা: ৯৫]

সুতরাং হারামে কোনো প্রকারের স্থলজ বন্য প্রাণী শিকার করা বৈধ নয়। ইহরাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহরামের বাইরে হোক কারও জন্যই এধরনের কোনো প্রাণী সরাসরি হত্যা করা, হত্যার কারণ হওয়া, ইশারা-ইঙ্গিত, কিংবা ছুরি-তরবারি ইত্যাদি দিয়ে হত্যায় সহায়তা করা কিছুই বৈধ নয়।

হ্যাঁ ইহরাম অবস্থায় সামুদ্রিক প্রাণী শিকার বৈধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾﴾ অর্থ: 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের ইহরামকারীদের জন্যে হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক। আল্লাহকে ভয় করো যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে'। [মায়িদা: ৯৬]

ইহরাম অবস্থায় যদি কেউ ইচ্ছাকৃত কোনো শিকার বধ করে তবে তাকে সেটার বিনিময় প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি গুনাহের কারণে তাওবা করা আবশ্যক হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾﴾ অর্থ: 'মুমিনগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে-বিনিময়ে জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে- তা হলো কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো। অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখতে হবে। যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। অতীতে যা হয়ে গেছে তা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু যে পুনরায় একই কাজ করবে আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম'। [মায়িদা: ৯৫] সুতরাং কেউ যদি হারামে কোনো কবুতর হত্যা করে তবে তাকে বিনিময় স্বরূপ একটি ছাগল দিতে হবে যেমনটা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য সাহাবা ফয়সালা করেছেন। এটা সে দুই উপায়ে সম্পন্ন করবে। হয়তো ছাগল জবাই করে কবুতরের ফিদইয়া স্বরূপ সেটার মাংস দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করবে। অথবা ছাগলের একটা মূল্য নির্ধারণ করে সেটা দিয়ে মিসকীনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করবে। প্রত্যেক মিসকীনকে আধা ছা' করে দিতে হবে। অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে একদিন খাওয়ানোর পরিবর্তে সেদিন রোযা রাখবে।

হারামে বিদ্যমান বন্য কাঁচা গাছপালা যা কোনো মানুষ রোপন করেনি- সেগুলো কাটা নিষিদ্ধ। তবে এই নিষিদ্ধ হবার কারণ ইহরাম অবস্থায় থাকা নয়। কারণ ইহরামের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটা নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ হলো হারামের সীমারেখার ভেতরে থাকা। ফলে ইহরাম অবস্থায় থাকা হোক কিংবা ইহরাম বিহীন হোক কারও জন্য হারামের ভেতরের কাঁচা ডালপালা কাটা বৈধ নয়। একই নীতিতে আরাফার গাছ কাটা মুহরিম কিংবা গাইরে মুহরিম সবার জন্য বৈধ কারণ সেটা হারাম সীমার বাইরে। বিপরীতে মুযদালিফা ও মীনাতে সবার জন্য গাছ কাটা অবৈধ কারণ সেটা হারাম-সীমার ভেতরে। হারামের ভেতরে প্রাণী শিকার যেমন সর্বাবস্থায় সবার জন্য নিষিদ্ধ গাছ কাটার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।

ওপরের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো নারী-পুরুষ সবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সতর্কতা: হারামের সীমার ভেতরে কুড়ানো বস্তু নিজের করে নেয়া কারও জন্যই বৈধ নয়। ইহরাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহরামবিহীন হোক সবার জন্য এটা নিষিদ্ধ। তবে প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে কুড়িয়ে নেয়া বৈধ। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, 'যেদিন আল্লাহ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকেই তিনি মক্কা নগরীকে 'হারাম' (সম্মানিত ও সুরক্ষিত) করেছেন। তাই আল্লাহ কর্তৃক এই সম্মান ও সুরক্ষার কারণে এটি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সম্মানিত ও সুরক্ষিত থাকবে। আমার পূর্বেকার কারো জন্য তা কখনো 'হালাল' (সুরক্ষা উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধের সুযোগ প্রদান) করা হয়নি, আমার পরবর্তী কারো জন্যও তা হালাল করা হবে না। আমার জন্যও মাত্র একদিনের সামান্য অংশের জন্যই তা হালাল করা হয়েছিল। তাই এটা আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান ও সুরক্ষার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত 'হারাম' (সুরক্ষিত) থাকবে। ফলে এখানের কাঁটা ছেঁড়া যাবে না। এখানের শিকারকে তাড়ানো যাবে না। রাস্তায় পড়ে থাকা কোন জিনিসকে মালিকের হাতে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কেউ তুলতে পাবে না। এখানের ঘাস ও উদ্ভিদ কাটা যাবে না'। আব্বাস (রা.) তখন বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'ইযখির' ব্যতীত। কেননা এটা তাদের নিত্যদিনের কর্ম ও ঘরের কাজে ব্যবহৃত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ইযখির ব্যতীত' (অর্থাৎ সেটা কাটা বৈধ)[১]।

সুতরাং কেউ হারামের ভেতরে কোনো বস্তু রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখতে পেলে সেটা কুড়িয়ে নিজে মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবেন। অথবা হারামে বিদ্যমান 'হারানো সামগ্রী' কেন্দ্রে জমা দিয়ে দিবেন।

দ্বিতীয় প্রকার: কেবল পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ:

এখানে সেসব বিষয় উল্লেখ করা হবে যা কেবল পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। নারীরা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বেন না।

১- মাথা ঢাকা। এটা নিষিদ্ধ হবার প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুহরিম কোন্ ধরনের কাপড় পরবে? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'জামা পরবে না। পাগড়ি পরবে না। পায়জামা পরবে না। কোট/জ্যাকেট (বারানিস) পরবে না...'[২]। এখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় পাগড়ি, জ্যাকেট ইত্যাদি পরতে নিষেধ করেছেন কারণ সেগুলো মাথা ঢাকে। ফলে মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হলো। একইভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীসে এসেছে, 'এক মুহরিম ব্যক্তি উটের পিঠ থেকে পড়ে মরে গেলো। তাকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন, 'তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাও। মাথা ঢেকো না। সুগন্ধি দিও না। কারণ সে মুহরিম অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে'[৩]। রাসূল তার মাথা ঢাকতে নিষেধ করেছেন কারণ সে ইহরাম অবস্থায় ছিল।

সুতরাং পুরুষের জন্য কোনো কিছু দিয়ে মাথা ঢাকা বৈধ হবে না। ফলে পাগড়ি, রুমাল, টুপি, হ্যাটসহ মাথার সঙ্গে লেগে থাকে এমন যে কোনো আবরণ জড়ানো নিষিদ্ধ হবে। কিন্তু মাথার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্তি নেই এমন বস্তু দিয়ে মাথা ঢাকা যেমন তাঁবু, ছাতা, গাড়ির ছাদ ইত্যাদি নিষিদ্ধ নয়। কারণ এগুলো পরিধান করা হয় না। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এর দীর্ঘ হাদীসে এই কথার প্রমাণ রয়েছে। তাতে এসেছে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'তাঁর জন্য নামিরা নামক স্থানে গিয়ে একটি তাঁবু টানানোর নির্দেশ দিলেন, অতঃপর নিজেও রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা নিশ্চিত ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মাশআরুল হারাম' নামক স্থানে অবস্থান করবেন, যেখানে কুরাইশরা জাহিলী যুগে অবস্থান করতো (জাত্যাভিমানের প্রতীক স্বরূপ তারা জনসাধারণের সাথে একত্রে আরাফাতে অবস্থান করতো না)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং এক পর্যায়ে আরাফাতে পৌঁছলেন। তিনি দেখতে পেলেন, নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তখন তিনি সেখানে অবতরণ করলেন'[৪]। একইভাবে উম্মুল হুসাইন (রা.) এর হাদীসও এর প্রমাণ। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করেছি। আমি তাঁর সঙ্গে উসামা ও বিলালকে দেখলাম। একজন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

(১) বুখারী (৩১৮৯)। মুসলিম (১৩৫৩; ৪৪৫)

(২) বুখারী (১৫৪৩)। মুসলিম (১১৭৭)

(৩) বুখারী (১৮৩৯)। মুসলিম (১২০৬; ৯৯)

(৪) মুসলিম (১২১৮; ১৪৭)

ওয়া সাল্লাম) উষ্ট্রীর লাগাম ধরেছিল। আরেকজন এক টুকরো কাপড় তাঁর মাথার ওপর উঁচু করে ধরে রোদ থেকে ছায়া দিচ্ছিল। এভাবে তিনি জামরায়ে আকাবাতে প্রস্তর নিক্ষেপ সম্পন্ন করেন'[১]।

ওপরের নীতি অনুসারে মাথায় নিজের ব্যাগ-বস্তা, গাঁটরি-পুঁটলি ইত্যাদি বহন করা বৈধ। কারণ যদিও সেটা মাথার সঙ্গে লেগে থাকে, তথাপি সেগুলো দ্বারা মাথা ঢাকা উদ্দেশ্য থাকে না। একইভাবে পানিতে ডুব দিয়ে গোসল করাও বৈধ। এতে যদিও মাথা পানির নিচে ঢাকা পড়ে যায় তথাপি সেখানে ঢাকা উদ্দেশ্য থাকে না।

২- সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা। এখানে সেলাইকৃত বলতে উদ্দেশ্য হলো সাধারণত সেসব কাপড় যা শরীরের মাপে কেটে সেলাই করা হয়। সেটা জামার মতো পুরো শরীর আবৃতকারী হোক কিংবা হাত মোজা বা পা মোজার মতো শরীরের ছোট্ট একটি অংশ আবৃতকারী হোক- যে কেনো সেলাইকৃত বস্ত পরা নিষিদ্ধ হবে। এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর হাদীস। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুহরিম কোন্ ধরনের কাপড় পরবে? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'জামা পরবে না। পাগড়ি পরবে না। পায়জামা পরবে না। কোট/জ্যাকেট (বারানিস) পরবে না। মোজা পরবে না। তবে কারও জুতো না থাকলে মোজা পরতে পারবে। সেক্ষেত্রে মোজা পায়ের গোড়ালির নিচে থাকতে হবে (অর্থাৎ পা যেন উন্মুক্ত থাকে)। একইভাবে তোমরা জাফরান বা ওয়ারস (তথা হলুদ) মিশ্রিত কাপড় পরিধান করবে না' [২]।

তবে যদি কারও সঙ্গে লুঙ্গি (ইযার) কিংবা সেটা কেনার আর্থিক সামর্থ্য না থাকে তবে পাজামা পরার অনুমতি রয়েছে। একইভাবে যদি জুতো না থাকে এবং জুতো কেনার টাকাও না থাকে তবে মোজা পরতে পারবে এবং সেটা ছোট করার দরকার হবে না। এতে কোনো গুনাহও হবে না। এর প্রমাণ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফার ময়দানে আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। তাতে বললেন, 'যার লুঙ্গি (ইযার) নেই সে যেন পায়জামা পরে নেয়। আর যার জুতো নেই সে যেন মোজা পরে নেয়'[৩]। ইবনে আব্বাসের উল্লিখিত হাদীস আরাফার ময়দানে ঘটেছে। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা মোজা পায়ের গোড়ালির নিচে রাখার জন্য ছোট করা সংক্রান্ত পূর্বের হাদীস রহিত হয়ে যাবে।

জামা সাধারণ নিয়মে না পরে শরীরের সঙ্গে (চাদরের মতো) পেঁচিয়ে নেয়া নিষিদ্ধ নয়।

একইভাবে আবাকাবা শরীরে না পরে যদি চাদরের মতো গায়ে জড়িয়ে নেয় তবে সেটাও নিষিদ্ধ নয়।

ইহরামের ইযার তথা লুঙ্গির ওপর বেল্ট পরা বৈধ। কোমরে বেল্ট জাতীয় যে কোনো বস্ত বাঁধা বৈধ।

একইভাবে ইহরাম অবস্থায় আংটি, হাতঘড়ি, চশমা, ইয়ারফোন ইত্যাদি পরা বৈধ। গলায় থলে বা পানির পাত্র বাঁধাও বৈধ।

প্রয়োজনে ইহরামের ইযার গিঁট দিয়ে বেঁধে নেয়া বৈধ। বিশেষত যদি খুলে যাবার আশংকা থাকে।

মোটকথা পূর্বোল্লিখিত ইবনে উমর (রা.) এর হাদীসে যেসব বস্ত পরতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো এবং সেই প্রকারের বস্তগুলোর বাইরে যে কোনো হালাল বস্ত সাধারণ অবস্থার মতো ইহরাম অবস্থায়ও পরা বৈধ। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইহরাম অবস্থায় কী পরা যাবে। তিনি 'কী পরা যাবে' সে উত্তর না দিয়ে 'কী কী পরা যাবে না' সেই উত্তর দিয়েছেন। বোঝা গেলো, সেগুলো এবং সেই প্রকারের জিনিসগুলো বাদ দিয়ে বাকি সবকিছু পরা যাবে।

তৃতীয় প্রকার: কেবল নারীর জন্য নিষিদ্ধ:

ইহরাম অবস্থায় নারীদের জন্য নিকাব, বোরকা, হাত মোজা পরা নিষিদ্ধ। এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস। পাশাপাশি এব্যাপারে ইবনে উমরের নিজস্ব বক্তব্যও রয়েছে যা সনদগতভাবে অধিকতর বিশুদ্ধ। তিনি বলেন, 'মুহরিম নারী নেকাব পরবে না। হাত মোজা পরবে না'[৪]। তবে যদি কাছাকাছি পরপুরুষের বিদ্যমান থাকার কারণে মুখ ঢাকার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে মাথার কাপড় কিংবা ওড়না মুখ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিবে। যেমনটা আয়েশা (রা.) থেকে প্রমাণিত। তিনি

---

(১) মুসলিম (১২৯৮; ৩১২)

(২) বুখারী (১৫৪৩)। মুসলিম (১১৭৭)

(৩) বুখারী (১৮৪৩)। মুসলিম (১১৭৮)

(৪) বুখারী (১৮৩৮)। মুয়াত্তা মালেক (১/৩২৮)। আরও দেখুন: আল-ইলাল, দারাকুতনী (১৩/৪২)

বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। তখন কাফেলা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো। যখনই তারা আমাদের বরাবর চলে আসতো তখন আমরা চাদর (জিলবাব) মাথা থেকে টেনে মুখের ওপর দিয়ে দিতাম। যখন তারা চলে যতো তখন আবার মুখ খুলে ফেলতাম’[১]। আয়েশা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত তিনি বলেন, ‘মুহরিম নারী যে কোনো পোশাক পরতে পারবে। তবে জাফরান ও ওয়ারস (হলুদ) মিশ্রিত কাপড় পরবে না। বোরকা পরবে না। মুখ ঢেকে রাখবে না। তবে চাইলে মুখের ওপর কাপড় (মাথার ওপর থেকে) ঝুলিয়ে দিতে পারবে’[২]। ফাতেমা বিনতে মুনযির (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘ইহরাম অবস্থায় আমরা আমাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতাম। তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক’[৩]।

নারীগণ তাদের মাথা ও চুল ঢেকে রাখবেন। অপরিচিত পুরুষের সামনে মুখও ঢাকবেন। তবে সেটা নেকাব ছাড়া অন্য কোনো বস্তু দিয়ে। একইভাবে তারা মোজাসহ অন্যান্য যে কোনো কাপড় পরতে পারেন। এটা আলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তবে শর্ত হলো সৌন্দর্যপ্রকাশের উদ্দেশ্যে হতে পারবে না।

নারী-পুরুষ সকলের জন্য ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা ও ধৌত করা, গোসলের সময় প্রয়োজনে সেগুলো শরীর থেকে খুলে ফেলা বৈধ।

---

(১) মুসনাদে আহমদ (২৪০২১)। আবু দাউদ (১৮৩৩)। আবু দাউদের বর্ণনার সনদে ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ হাশেমী রয়েছে। তিনি দুর্বল। তবে পরবর্তী বর্ণনাকারীদের কারণে তাকে শক্তিশালী ধরা যায়।

(২) বুখারী তাঁর সহীহতে সনদ উল্লেখ না করে (মুআল্লাকান) বর্ণনা করেছেন (২/১৩৭)। সুনানে কুবরাতে বাইহাকী সনদসহ বর্ণনা করেছেন (৫/৪৭)। ‘ইরওয়াউল গলীল’ গ্রন্থে (৪/২১২) শাইখ আলবানী বলেন, ‘বাইহাকী এটাকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন’।

(৩) মুয়াত্তা মালেক (১/৩২৮)। ইরওয়াউল গলীলে (৪/২১২) শাইখ আলবানী বলেন, ‘এটার সনদ সহীহ’।

অষ্টম অধ্যায়: নিষিদ্ধ বিষয়গুলো লঙ্ঘনের ফিদইয়া

ফিদইয়া বিবেচনায় নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর প্রকারভেদ:

ফিদইয়া বিবেচনায় ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো চার প্রকারে ভাগ করা যায়:

প্রথম প্রকার: যেক্ষেত্রে ফিদইয়া প্রযোজ্য নয়। যথা বিবাহের আকদ করা।

দ্বিতীয় প্রকার: যেক্ষেত্রে ফিদইয়া হিসেবে উট প্রদান করতে হবে। হজ্জ থেকে প্রাথমিকভাবে হালাল হওয়ার আগেই যৌনমিলন করলে এই ফিদইয়া দিতে হবে।

তৃতীয় প্রকার: যেক্ষেত্রে ফিদইয়া হলো হুবহু সেই বস্তুটি কিংবা সে জাতীয় কোনো কিছু। উদাহরণত শিকার হত্যা করা।

চতুর্থ প্রকার: যেসব বিষয়ের ফিদইয়া হলো রোযা রাখা, সদকা প্রদান কিংবা কুরবানী।

মাথা মুণ্ডনের ফিদইয়া হিসেবে উক্ত প্রকারের আলোচনা কুরআনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ﴾ অর্থ: ‘তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত না কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে যায়। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তাহলে রোযা কিংবা সদকা বা কুরবানীর মাধ্যমে এর ফিদইয়া দিবে’। [বাকারা: ১৯৬] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই রোযা, সদকার পরিমাণ বলে দিয়েছেন (যা সামনে আসছে)। কুরবানীর ক্ষেত্রে ছাগল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কা’ব ইবনে উজরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন, ‘বোধহয় তোমার মাথার উঁকুনগুলো তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে’? তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল! তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, ‘তুমি তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেলো। অতঃপর তিন দিন রোযা রাখো। অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও। কিংবা একটা ছাগল কুরবানী করো’[১]। এখানে ছাগল বলতে কুরবানীর উপযুক্ত বয়সের ছাগল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি সেটা সবধরনের বিচ্যুতি ও ত্রুটি মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

আলিমগণ এই প্রকারের ফিদইয়াকে ‘কষ্টের ফিদইয়া’ (ফিদইয়াতুল আযা) আখ্যা দিয়ে থাকেন। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে এটাকে এই নামে অভিহিত করে বলেন, ﴿أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ﴾ ‘কিংবা যার মাথায় কষ্ট থাকে’। [বাকারা: ১৯৬]

কুরআনে কেবল মাথা মুণ্ডনের ফিদইয়ার কথা থাকলেও আলিমগণ প্রথমোক্ত তিন প্রকারের নিষিদ্ধ কাজ ছাড়া ইহরামের অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ এই চতুর্থ প্রকারের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। ফলে প্রথম তিন প্রকারের নিষিদ্ধ কাজের বাইরে ইহরামের সকল নিষিদ্ধ কাজের ফিদইয়া মাথা মুণ্ডানোর ফিদইয়ার অনুরূপ।

নিষিদ্ধ কাজগুলো সংঘটনের সম্ভাব্য তিন অবস্থা:

মুহরিম ব্যক্তি যখন ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডানো, অথবা সুগন্ধি ব্যবহার, কিংবা যৌন মিলন বা শিকার হত্যাসহ এধরনের কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হবে- তখন সেটার তিন ধরনের অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: ভুলে, অজ্ঞাতসারে, বাধ্য হয়ে কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় এধরনের নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সেটা ক্ষমাযোগ্য। এতে গুনাহ হবে না। ফিদইয়া দিতে হবে না। হজ্জ কিংবা উমরা নষ্ট হবে না। এর দলীল কুরআন-সুন্নাহর সেসব বক্তব্য যেগুলোতে এসব অবস্থায় মানুষকে মাযূর গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ ‘হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি বিস্মৃত হয়ে যাই বা ভুল করি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না’। [বাকারা: ২৮৬] হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা (উক্ত প্রার্থনার জবাবে) বলেন, ‘আমি প্রার্থনা কবুল করে নিলাম’[২]। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ﴾ অর্থ: ‘তোমরা ভুল করে ফেললে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা’। [আহযাব: ৫]

---

(১) বুখারী (১৮১৪)। মুসলিম (১২০১)। এটা বুখারীর ভাষ্য।

(২) মুসলিম (১২৬)। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীস।

আল্লাহ তাআলা শিকার হত্যা প্রসঙ্গে কুরআনে বলেছেন ﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে তার বধকৃত জন্তুর সমান'। [মায়িদা: ৯৫]

এখানে আল্লাহ তাআলা শিকারের বিনিময় দেয়ার প্রসঙ্গ ইচ্ছাকৃত হত্যার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আর ইচ্ছাকৃত হওয়াটা যে কোনো শাস্তি ও জরিমানার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সুতরাং এক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য হবে। ফলে উপরিউক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে: 'আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে করবে না তাকে প্রতিদান দিতে হবে না এবং তার গুনাহও হবে না'।

সতর্কতা: যখনই উজর চলে যাবে যথা জাহেল যখন জ্ঞান লাভ করবে, ভুলে যাওয়া ব্যক্তির যখন মনে আসবে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যখন সজাগ হয়ে যাবে, কিংবা বাধ্য ব্যক্তির যখন বাধ্যবাধকতা চলে যাবে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে এবং সেটা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করতে হবে।

উজর চলে যাওয়ার পরেও কেউ যদি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকে তবে তার ওপর ফিদইয়া দেয়া আবশ্যক হবে। গুনাহ ও অন্যায় বিবেচিত হবে। ফলে একদিকে তাওবা করতে হবে। অপরদিকে ফিদইয়াও দিতে হবে।

উদাহরণত মুহরিম ব্যক্তি যদি ঘুমন্ত অবস্থায় মাথা ঢেকে ফেলে তবে যতক্ষণ ঘুমে থাকবে সেটা অন্যায় বিবেচিত হবে না। কিন্তু সজাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মাথা খুলে ফেলতে হবে। যদি সজাগ হবার পরে মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ জেনেও ঢেকে রাখে তবে অবাধ্য ও গুনাহগার বিবেচিত হবে। পূর্বোক্ত নিয়মে ফিদইয়া আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: মুহরিম ইচ্ছাকৃত কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলো। কিন্তু সেটার পেছনে উজর বিদ্যমান রয়েছে। এমন অবস্থায় তাকে নিষিদ্ধ বস্তুতে লিপ্ত হবার কারণে ফিদইয়া দিতে হবে। কিন্তু গুনাহ হবে না। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ﴾ অর্থ: 'তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত না কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে যায়। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে রোযা কিংবা সদকা বা কুরবানীর মাধ্যমে এর ফিদইয়া দিবে'। [বাকারা: ১৯৬] উজরের কারণে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হলো কা'ব ইবনে উজরা (রা.) এর ঘটনা। তাকে যখন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে নিয়ে আসা হলো তখন তার মাথা থেকে মুখে উকুন ঝরে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে বললেন, 'তোমার এই অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা ছিল না। তোমার কাছে কোনো ছাগল নেই'? তিনি বললেন, 'না'। রাসূল বললেন, 'তাহলে তিন দিন রোযা রাখো। অথবা ছয় জন মিসকীনকে আধা সা' করে খাবার খাওয়াও। এবং মাথা কামিয়ে নাও'[১]।

তৃতীয় অবস্থা: মুহরিম ব্যক্তি বিবাহের আকদ কিংবা স্ত্রীমিলন এই দু'টো কাজ ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে এবং উজর ছাড়া অন্য কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলো। এতে তার ফিদইয়া দিতে হবে। গুনাহও হবে। ফলে দ্রুত তাওবা এবং ফিদইয়া আদায় করতে হবে।

(১) বুখারী (৪৫১৭)। মুসলিম (১২০১; ৮৫)

নবম অধ্যায়: উমরার বিবরণ

উমরার আরকানসমূহ:

রোকন শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো, ভিত্তি, স্তম্ভ, খুঁটি, মূল অংশ ইত্যাদি[১]।

পরিভাষায় রোকন বলা হয়, কোনো বস্তুর অন্তর্গত মূল বিষয় যা দ্বারা সেটা পূর্ণতা লাভ করে[২]। হজ্জ ও উমরার ক্ষেত্রে রোকন বলতে বোঝানো হয়, শরীয়ত প্রণেতা যা আবশ্যকীয়ভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন। যার কোনো বিকল্প নেই।

উমরার রোকন তিনটি:

প্রথম রোকন: ইহরাম বাঁধা।

দ্বিতীয় রোকন: কাবার চারপাশে তওয়াফ করা।

তৃতীয় রোকন: সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।

উমরার ওয়াজিবসমূহ:

ওয়াজিব শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো: আবশ্যক হওয়া। অপরিহার্য হওয়া[৩]।

পরিভাষায় ওয়াজিব বলা হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগকারী শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দাযোগ্য। ওয়াজিবের আরেকটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যার অনুসরণকারী পুরষ্কারপ্রাপ্ত। আর যা পরিত্যাগকারী শাস্তিযোগ্য।

উমরার ওয়াজিবসমূহ: দু'টো ওয়াজিব:

প্রথম ওয়াজিব: মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

দ্বিতীয় ওয়াজিব: মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছোট করা।

রোকন ও ওয়াজিবসহ উমরার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে:

ইহরাম হলো উমরাতে প্রবেশের নিয়ত। আর নিয়তের স্থান হলো হৃদয়। ফলে 'হে আল্লাহ আমি উমরার নিয়ত করছি' এই জাতীয় কোনো বাক্য মুখে উচ্চারণ করা রীতিসিদ্ধ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম থেকে হজ্জ, উমরা, সালাত, যাকাত কিংবা কোনো ধরনের ইবাদতে নিয়তের মৌখিক উচ্চারণ প্রমাণিত নয়। বরং পার্থিব কাজেও নিয়তের এই ধরনের মৌখিক ঘোষণা আকলসিদ্ধ নয়। 'আমি পানি পানের নিয়ত করলাম' এটা বলে কাউকে পানি পান করতে দেখা যায় না। কারণ কারও পানির গ্লাস হাতে নেয়ার অর্থই হলো সেটা সে পান করবে। পান না করলে গ্লাস হাতেই নিতো না। একই কথা ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোনো ব্যক্তির মীকাতে আসা, ইহরামের কাপড় পরাই প্রমাণ করে সে হজ্জ বা উমরার জন্য এসেছে। একইভাবে কারও উজু করে দাঁড়িয়ে তাকবীর দেয়াই প্রমাণ করে সে সালাতের জন্য দাঁড়িয়েছে। ফলে আলাদা করে মুখে নিয়ত করা অর্থহীন।

হজ্জ বা উমরার ইহরামের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হলো:

১- গোসল করা। ফলে ফরজ গোসলের মতো পূর্ণ গোসল করবেন। এটা নারী ও পুরুষ সবার জন্য প্রযোজ্য। এই সময় কোনো নারী হায়েজ বা নেফাসগ্রস্ত থাকলেও গোসল করবেন। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জের বিবরণ সংশ্লিষ্ট জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর (রা.) দীর্ঘ হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। তাতে এসেছে তিনি বলেন, আমরা যখন যুল হুলাইফাতে এসে পৌঁছলাম তখন আসমা বিনতে উমাইস আবু বকরের ছেলে মুহাম্মাদকে জন্ম দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করণীয়

---

(১) লিসানুল আরব (১৩/১৮৫)

(২) আল-হুদূদুল আনীকাহ ওয়াত তা'রীফাতুদ দাকীকাহ (৭১)

(৩) লিসানুল আরব (১/৭৯৩)

জিজ্ঞাসা করার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি বললেন, 'গোসল করবে। পট্টি (বা ন্যাকড়া) বাঁধবে। অতঃপর ইহরাম বেঁধে নিবে'[১]।

২- সুগন্ধি ব্যবহার করা। সুতরাং গোসলের পরে মাথা ও দাড়িতে ভালো করে মেশক, ঊদ এ জাতীয় আতর ব্যবহার করবেন। ইহরামের পরে এর ঘ্রাণ অবশিষ্ট থাকাতে কোনো ক্ষতি নেই। এর প্রমাণ আয়েশা (রা.) এর হাদীসে পাওয়া যায়। 'তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালো করে খুশবু মেখে দিতাম। এমনকি আমি তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে খুশবুর ঝিলিক দেখতে পেতাম'[২]।

গোসল ও সুগন্ধি ব্যবহার শেষে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। পুরুষের জন্য এটি একটি লুঙ্গি (ইযার) ও একটি চাদর। নারীর ক্ষেত্রে ইহরামের বিশেষ কোনো কাপড় নেই। বরং তারা যে কোনো ধরনের কাপড় পরতে পারেন। তবে সৌন্দর্য প্রকাশ করে এমন কাপড় পরতে পারবেন না। নেকাব পরবেন না। হাত মোজা পরবেন না। মুখ ঢাকবেন না। পেছনে ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে এই আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে দলীলসহ এটাও বলা হয়েছে যে, গাইরে মাহরাম নয় এমন পরপুরুষের সামনে নারী মুখ আবৃত রাখবেন।

অতঃপর সেটা যদি ফরজ সালাতের সময় হয়ে থাকে তবে ইহরামকারী সালাত আদায় করবেন। কেবল হায়েজ ও নেফাসগ্রস্ত নারী সালাত আদায় করবেন না। আর যদি সেটা ফরজের সময় না হয়ে থাকে তবে ইহরামের দুই রাকাআত নফল সালাত আদায় করবেন। এটা সুন্নাত। পড়লে পুণ্য রয়েছে না পড়লে গুনাহ নেই। সালাত ছাড়াও ইহরাম বিশুদ্ধ ইনশাআল্লাহ[৩]।

সালাত শেষ করে মুহরিম গাড়িতে আরোহণ করবেন। গাড়িতে আরোহণের সময় মনে মনে নিয়ত করবেন এবং বলবেন, 'লাব্বাইকা উমরাতান'। এর দলীল আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (উটের) পা-দানিতে পা রাখার পরে যখন সেটা সোজা হয়ে দাঁড়াতো, তখন তিনি যুল হুলাইফা মসজিদ থেকে ইহরাম বাঁধতেন'[৪]। অতঃপর আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা সংবলিত তালবিয়া পাঠ করবেন। আর সেটা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তালবিয়া। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম বাঁধা সম্পর্কে বলেন, 'অতঃপর তিনি তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে বললেন, 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শরীকা লাক'। [অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি উপস্থিত। হে প্রভু আমি হাজির। আমি হাজির আপনার কোন শরীক নেই আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আপনার। রাজত্ব কেবলই আপনার। আপনার কোন শরীক নেই'।] উপস্থিত লোকজনও এভাবে ইহরাম বাঁধলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কাজের বিরোধিতা করেননি। বরং তিনি নিজের তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখেন'[৫]। কেউ চাইলে আরেকটু বৃদ্ধি করে এভাবেও পড়তে পারেন, 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইক। ওয়াল খাইরু ফী ইয়াদাইক। লাব্বাইকা ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমাল'। কারণ উমর ইবনুল খাত্তাব ও তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে এটুকু সংযোজন প্রমাণিত[৬]।

এই তালবিয়া হাজী ও উমরাকারীর সর্বপ্রথম কাজ। এটা উমরা ও হজ্জের প্রতীক। এক বিশাল ভারী ও মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নির্দেশক। বরং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর নিদর্শন। আর তা হলো, এক আল্লাহর একত্ববাদ বাস্তবায়ন। লা শরীক ইলাহের জন্য ইবাদত অর্পণ। এটা সর্ব যুগের সব সময়ের সকল প্রকারের জাহেলিয়্যাতের ওপর কুঠারাঘাত। যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে। যারা তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকে। অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। যারা গাইরুল্লাহর জন্য জবাই করে। মানত করে। যারা গাইরুল্লাহর কাছে মদদ ও রিযিক প্রার্থনা করে। ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগের মানুষেরা তালবিয়ার মাঝেও শিরক করতো। যেমনটা আব্দুল্লাহ

---

(১) মুসলিম (১২১৮)

(২) বুখারী (৫৯২৩)। মুসলিম (১১৮৮)

(৩) ইবনে জামাআহ বলেন, 'ইহরামের সুন্নাতের নিয়তে দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। এটা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত'। (হিদায়াতুস সালিক: ১/৬২৫)

(৪) বুখারী (২৮৬৫)। মুসলিম (১১৮৭)

(৫) মুসলিম (১২১৮)

(৬) মুসলিম (১১৮৪)

ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীসে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, মুশরিকরা বলতো- 'লাব্বাইকা লা শরীকা লাক' [আমরা হাজির। আপনার কোনো শরীক নেই]। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, 'সর্বনাশ! অবশ্যই অবশ্যই'। অতঃপর তারা বলতো, 'তবে সেই শরীক ছাড়া যাদেরকে আপনি গ্রহণ করেছেন। রাজত্ব আপনার এবং তাদের'। এটা তারা বাতুল্লাহ তওয়াফের সময় বলতো[১]!

পুরুষের জন্য উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ সুন্নাত। এর প্রমাণ সায়েব ইবনে খাল্লাদ (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমার কাছে জিবরাঈল (আ.) এসে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি আমার সাহাবাদেরকে ও যারা আমার সঙ্গে রয়েছে তাদেরকে উচ্চস্বরে ইহরাম পাঠের আদেশ করি'[২]।

উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ মূলত তাওহীদের উচ্চকণ্ঠের ঘোষণা। একত্ববাদের জবরদস্ত ইলান। আল্লাহর অদ্বিতীয়ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। আর এটা হজ্জের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এতটা সুউচ্চ কণ্ঠে তালবিয়া পাঠ করতেন যে তাদের গলা ভেঙে যেতো! মুত্তালিব ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণ এতটা সমুচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতেন যে তাদের গলা ভেঙে যেতো'[৩]। বকর ইবনে আব্দুল্লাহ মুযানী বলেন, আমি ইবনে উমর (রা.) এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এতোটা জোরে তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন যে, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পুরো অঞ্চলে তা ধ্বনিত হলো'[৪]। একাধিক সালাফ থেকে প্রমাণিত, 'তালবিয়া হজ্জের অলংকার'[৫]। এটা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্তব্য দ্বারাও প্রমাণিত[৬]।

তবে নারীগণ পুরুষের সামনে তালবিয়া কিংবা কোনো দুআই উচ্চকণ্ঠে পড়বেন না। কারণ তাদের ক্ষেত্রে নিম্নস্বরে পাঠ উত্তম।

তালবিয়া পাঠকারীর 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' কথার অর্থ হলো, হে আল্লাহ আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আমি সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আমি আপনার আনুগত্যের ওপর অবিচল রয়েছি[৭]। এটা মূলত আল্লাহর সেই আহ্বানে সাড়া যেই আহ্বান তিনি নবী ইবরাহীমের মাধ্যমে করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ٢٧﴾ অর্থ: 'এবং মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করো। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে। তারা আসবে দূর-দূরান্ত থেকে'। [হজ্জ: ২৭]

মুহরিম ব্যক্তি যদি এমন আশংকা করেন যে, অসুস্থতা, শত্রুর ভয় কিংবা গ্রেফতার ইত্যাদির কারণে তিনি হয়তো হজ্জ বা উমরা আদায় করতে পারবেন না- কিংবা এমন আশংকা থাকে যে, মহামারীর উপদ্রব কিংবা অন্য কোনো সমস্যার কারণে তিনি হয়তো হজ্জ বা উমরা শুরু করলেও সম্পূর্ণ করতে পারবেন না- এমতাবস্থায় মুস্তাহাব হলো, ইহরামের তালবিয়া বাঁধার সময় 'লাব্বাইকা উমরাতান' বলার পরে তিনি বলবেন, 'ফা-ইন হাবাসানী হাবিসুন ফামাহিল্লী হাইসু হাবাসতানী' [যদি আমার সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে তবে সেটাই আমার হালাল হবার স্থান]। এটা আয়েশা (রা.) এর একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবাআ বিনতুন যুবাইরের কাছে গিয়ে বলেন, 'তুমি সম্ভবত হজ্জ করতে চাচ্ছো'? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হ্যাঁ। কিন্তু আমি প্রচণ্ড অসুস্থ। রাসূল তাকে বললেন, 'হজ্জের ইহরাম

---

(১) মুসলিম (১১৮৫)

(২) আবু দাউদ (১৮১৪)। নাসায়ী (২৭৫৩)। তিরমিযী (৮২৯)। ইবনে মাজাহ (২৯২২)। আহমদ (১৬৫৬৭)। তিরমিযী বলেছেন, 'হাদীসটি হাসান'।

(৩) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৩/৩৭৩)। ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে (৩/৪০৮) বলেন, 'এর সনদ সহীহ'।

(৪) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৩/৩৭৩)। ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে (৩/৪০৮) বলেন, 'এর সনদ সহীহ'।

(৫) দেখুন: মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৩/৩৭৩)

(৬) মুসনাদে আহমদ (১৮৭০)। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীস।

(৭) দেখুন: আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস (৪/২২২)

বাঁধো। সঙ্গে শর্ত রাখো। এভাবে বলো, 'হে আল্লাহ আপনি আমাকে কোথাও আটকে দিলে সেটাই আমার হালাল হবার স্থান'[১]।

এই শর্ত রাখার উপকারিতা হলো, যদি মুহরিম পথে অসুস্থতা, গ্রেফতারসহ এমন কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন যে কারণে তার পক্ষে উমরা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়, তবে তিনি তখনই হালাল হয়ে যেতে পারবেন। একারণে তার কোনো অপরাধ হবে না কিংবা তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

মুহরিম ব্যক্তির জন্য অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ মুস্তাহাব। বিশেষত সময় ও অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেটা আরও বেশি জরুরি ও উত্তম। যথা মুহরিম যখন কোনো উঁচু স্থানে আরোহণ করবেন কিংবা নিম্নভূমিতে অবতরণ করবেন, অথবা যখন ফরজ সালাত পড়বেন, অথবা দিন-রাতের আগমন ও প্রস্থানকালে, বন্ধুদের সঙ্গে মিলনকালে, কিংবা যখন অন্য কাউকে তালবিয়া পাঠ করতে দেখবেন, অথবা ভুলে কোনো নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়বেন, কিংবা যখন যানবাহনে আরোহণ বা অবতরণ করবেন, অথবা বাইতুল্লাহ দেখবেন- প্রত্যেক অবস্থায় তালবিয়া পাঠ খুবই ফজীলতের কাজ।

তবে সম্মিলিতভাবে তালবিয়া পাঠ শরীয়তসিদ্ধ নয়। কারণ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকে এমন করা প্রমাণিত নয়। ফলে প্রত্যেকে নিজের মতো করে তালবিয়া পাঠ করবেন।

উমরার ক্ষেত্রে ইহরাম বাঁধা থেকে শুরু করে কাবা ঘরের তওয়াফ শুরু পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখবেন। তওয়াফ শুরু করলে তালবিয়া বলা বন্ধ করবেন। আর হজ্জের ক্ষেত্রে তালবিয়া পাঠ ঈদের দিন জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

মক্কার কাছাকাছি এসে পৌঁছলে যদি সম্ভব হয় তবে পবিত্র শহরে প্রবেশের পূর্বে গোসল করে নেয়া সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর হাদীস এর প্রমাণ। নাফে' বলেন, 'ইবনে উমর মক্কায় প্রবেশের পূর্বে 'যু-ত্বওয়া' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করতেন। ভোর হলে গোসল করতেন অতঃপর দিনের আলোতে মক্কায় প্রবেশ করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন করেছেন'[২]।

উঁচুভূমি থেকে মক্কায় প্রবেশ করা আর নিম্নভূমি থেকে বের হওয়া সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাতহা (এলাকার) সানিয়া উলিয়া (উঁচু ভূমি) তে অবস্থিত 'কাদা' অঞ্চল দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সানিয়া সুফলা (তথা নিম্ন ভূমি) থেকে বের হন'[৩]। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কাতে উঁচু জায়গা থেকে প্রবেশ করেন। আর নিচু জায়গা থেকে বের হন'[৪]।

'কাদা' হলো মক্কার সর্বোচ্চ উঁচু স্থানে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এটা বর্তমানে 'রাইউল হুজূন' নামে পরিচিত। মুআল্লা কবরস্থানে এই পথ ধরে যেতে হয়।

আর 'সানিয়া সুফলা' বর্তমানে 'রাইউর রিসাম' নামে পরিচিত। এটা 'হারায়ে বাব' (বাব মহল্লা) থেকে 'জারওয়াল' এলাকায় যাওয়ার পথ।

সুতরাং হাজী সাহেব যদি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন ও নির্গমন পথ ধরে মক্কায় প্রবেশ ও বের হতে পারেন তবে সেটা সর্বোত্তম। কিন্তু সেটা যদি সম্ভব না হয় তবে যে কোনো পথ দিয়েই আসতে বা যেতে পারেন। সবগুলো পথে চলাচল বৈধ।

মসজিদে হারামে পৌঁছার পরে সর্বপ্রথম ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নাত। প্রবেশের সময় এই দুআ পড়া সুন্নাত: 'বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। ওয়া আঊযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। আল্লাহুম্মাফ-তাহলী আবওয়া রাহমাতিক'।

---

(১) বুখারী (৫০৮৯)। মুসলিম (১২০৭)

(২) বুখারী (১৫৭৩)। মুসলিম (১২৫৯; ২২৭)

(৩) বুখারী(১৫৭৬)। মুসলিম (১২৫৭)

(৪) বুখারী (১৫৭৭)। মুসলিম (১২৫৮)

আবু হুমাইদ অথবা আবু উসাইদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশের সময় যেন বলে, 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক'। আর বের হবার সময় যেন বলে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাজলিক'[১]।

এটা মসজিদে হারামসহ পৃথিবীর সকল মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে কাবা ঘরের কাছে আসবেন। তওয়াফ শুরুর জন্য হজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) বরাবর কাবাঘর অভিমুখী হয়ে দাঁড়াবেন। মুখে 'আমি তওয়াফের নিয়ত করলাম' এই জাতীয় কিছু বলবেন না। কারণ এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়। উপরন্তু নিয়তের স্থান মুখ নয়; হৃদয়।

এই তওয়াফ 'ইফরাদ' ও 'ক্বিরান' হজ্জ আদায়কারীর ক্ষেত্রে 'তওয়াফে কুদূম' বা আগমনী তওয়াফ নামে পরিচিত। কারণ মক্কায় আগমনের পরে সর্বপ্রথম এই তওয়াফ করা হয়ে থাকে। 'তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারীর ক্ষেত্রে এটা 'তওয়াফে উমরা'। কারণ তিনি এটার মাধ্যমে উমরা করে থাকেন। এই তওয়াফের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো, সবগুলো প্রদক্ষিণে 'ইযতিবা' করা। প্রথম তিন প্রদক্ষিণে 'রমল' করা। বাকি চার প্রদক্ষিণ স্বাভাবিকভাবে হেঁটে সম্পন্ন করা।

'ইযতিবা' হলো- ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা। অর্থাৎ চাদরের মাঝামাঝি স্থান ডান বগলের নিচে রেখে দুই পার্শ্ব বাম কাঁধের ওপর ছড়িয়ে দেয়া।

আর 'রমল' হলো ছোট ছোট পায়ে দ্রুত চলা।

তওয়াফের সময় ঘুরে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে গেলে চারটি অবস্থা হতে পারে। ধারাবাহিকভাবে নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হচ্ছে:

প্রথম অবস্থা: যদি সম্ভব হয় তবে ডান হাত দিয়ে হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবেন। অতঃপর মুখ দ্বারা সেটা চুম্বন করবেন। তখন মুখে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলবেন। এটা আল্লাহর প্রতি সম্মান এবং রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ করবেন। এমন কোনো বিশ্বাস রেখে করবেন না যে, পাথর তাকে কোনো প্রকারের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে। কারণ এটা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য; পাথরের নয়। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হজরে আসওয়াদের কাছে এসে সেটাকে চুম্বন করলেন। অতঃপর বললেন, 'আমি জানি তুমি তো স্রেফ একটি পাথর। তোমার কোনো লাভ বা ক্ষতি করার সামর্থ্য নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুম্বন করতে না দেখতাম তবে তোমাকে চুম্বন করতাম না'[২]।

উক্ত বক্তব্যে তাওহীদের গুরুত্ব ও এক লা শরীক ইলাহের ইবাদতের তাৎপর্য দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। এটা সুস্পষ্ট করে দেয়, পাথরের কোনো উপকার-অপকারের সামর্থ্য নেই। এটা একমাত্র আল্লাহর হাতে। পাশাপাশি এখানে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্যের তাৎপর্য এবং দীনের মাঝে বিদআত সৃষ্টি না করার আবশ্যকীয়তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যদি হজরে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করা সম্ভব না হয় তবে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করবেন। সেটা হলো:

দ্বিতীয় অবস্থা: হাত দ্বারা হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে হাত চুম্বন করবেন। চুম্বন করার সময় 'বিসমিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার' বলবেন। নাফে' থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি ইবনে উমরকে হাত দ্বারা হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে অতঃপর সেই হাত চুম্বন করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন, যখন থেকে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি করতে দেখেছি তখন থেকে এটা পরিত্যাগ করিনি'[৩]।

যদি এটাও করা সম্ভব না হয় তবে পরবর্তী অবস্থায় স্থানান্তরিত হবে:

তৃতীয় অবস্থা: হাতে থাকা লাঠি কিংবা অন্য কিছু দ্বারা হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবেন অতঃপর সেটা চুম্বন করবেন। মুখে বলবেন, 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার'। আবুত তুফাইল (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

---

(১) মুসলিম (৭১৩)

(২) বুখারী (১৫৯৭)। মুসলিম (১২৭০)

(৩) বুখারী (১৫৯৭)। মুসলিম (১২৭০)

‘আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইতুল্লাহ তওয়াফ করতে দেখেছি। তিনি হাতের একটি লাঠি দ্বারা (হজরে আসওয়াদের) কোণ স্পর্শ এবং সেটা চুম্বন করছিলেন’[১]।

যদি এটাও করা সম্ভব না হয় তবে চতুর্থ ও সর্বশেষ ধাপে পরিবর্তিত হবে। সেটা হলো:

চতুর্থ অবস্থা: হাত দ্বারা হজরে আসওয়াদের দিকে ইঙ্গিত করবেন। এটা দূর থেকেও করা যায়। তখন মুখে বলবেন, ‘বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার’। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটের ওপর বসে তওয়াফ করেছেন। তিনি যখনই (হজরে আসওয়াদের) কোণে পৌঁছতেন তখন ইশারা করতেন এবং তাকবীর দিতেন’[২]।

অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি যখন (হজরে আসওয়াদ) কর্ণারে পৌঁছতেন তখন হাতে থাকা কোনো বস্তু দিয়ে ইশারা করতেন অতঃপর তাকবীর দিতেন’[৩]।

আরও একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমর (রা.) কে বলেন, ‘আবু হাফস! তুমি শক্তিশালী মানুষ। তাই হজরে আসওয়াদের ওপর ধাক্কাধাক্কি করবে না। তাতে দুর্বলরা কষ্ট পাবে। হ্যাঁ যদি ফাঁকা পাও তবে স্পর্শ ও চুম্বন করো। নতুবা (দূর থেকে) তাকবীর দিয়ে চলে যাও’[৪]।

প্রথম তিন অবস্থার ক্ষেত্রে তওয়াফকারীর জন্য মনে রাখা আবশ্যক যে, তিনি যেন অন্যান্য তওয়াফকারীদেরকে কষ্ট না দেন। কারও ক্ষতি না করেন। কারণ হজরে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করা সুন্নত। বিপরীতে মানুষকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। সুতরাং সুন্নাতের পরিবর্তে ওয়াজিব রক্ষা করা বেশি জরুরি। একইভাবে তওয়াফকারী নিজে যদি শক্তিশালী হন- তবুও ভিড় থাকলে হজরে আসওয়াদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকা উত্তম। কারণ তাতে তিনি নিজে স্পর্শ ও চুম্বন করতে পারলেও তার দ্বারা দুর্বল হাজীরা কষ্ট পাবেন। তাই সর্বাবস্থায় এই মহা পবিত্রতম স্থানের মহিমা ও এখানে আগত আল্লাহর মেহমানদের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া, ক্ষমা প্রদর্শন করা জরুরি। কেবল হতভাগা মানুষরাই মানুষের প্রতি দয়াশূন্য হয়। তাই হাজীর কর্তব্য হলো, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও অবনত থাকা। এই বিনয়, খুশু ও প্রভুভক্তির সাগরে নিমজ্জিত থাকার ফলে তিনি সবধরনের ভিড়, ঠেলাঠেলি, মানুষকে কষ্টদান থেকে বিরত থাকবেন। এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিবেদিত তওয়াফকে ইবাদত হিসেবে রাখবেন। অনর্থক কথা, ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত যেন না গড়ায় সে ব্যাপারে সবিশেষ যত্নবান থাকবেন।

নারীদেরও সর্বোচ্চ কর্তব্য হলো পুরুষের ভিড় এড়িয়ে চলা। এতে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত হয়ে যাওয়াসহ যে কোনো ধরনের অযাচিত পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া যাবে। বরং যখন কেবল নারীদেরকে হজরে আসওয়াদের পাশে দেখবেন তখন চুম্বন করার চেষ্টা করবেন।

হজরে আসওয়াদ বরাবর ‘বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার’ বলার পরে তওয়াফকারী ডান দিকে হাঁটা শুরু করবেন। কাবা ঘর থাকবে বাম দিকে। রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছার পরে সম্ভব হলে সেটা হাত দ্বারা স্পর্শ করবেন। চুম্বন করবেন না। আর যদি সেখানে ভিড় থাকে তবে ধাক্কাধাক্কি করতে যাবেন না। বরং কিছুই করবেন না। দূর থেকে (হজরে আসওয়াদের মতো) ইশারাও করবেন না।

হজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া কাবাঘরের আর কোনো অংশ স্পর্শ করবেন না। কারণ কাবার কেবল এই দু’টো অংশই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক নির্মিত ভিত্তির ওপর বিদ্যমান রয়েছে। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দু’টো অংশ ছাড়া বাইতুল্লাহর আর কোনো অংশ স্পর্শ করেননি। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইতুল্লাহর দুই কোণ (তথা হজরে আসওয়া ও রুকনে ইয়ামানী) ছাড়া আর কিছু স্পর্শ করতে দেখিনি’[৫]।

---

(১) মুসলিম (১২৭৫)

(২) বুখারী (৫২৯৩)

(৩) বুখারী (১৬৩২)

(৪) মুসান্নাফে আব্দির রাযযাক (৫/৩৬)। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৩/১৭১)। সুনানে মা’সূরাহ, শাফেয়ী (৫১০)। মুসনাদে আহমদ (১৯০)। অন্য সনদে তাহযীবুল আসার, তাবারী (১/৮৫; ১০৬- মুসনাদে ইবনে আব্বাস)। সুনানে কুবরা, বাইহাকী (৫/৮০)

(৫) বুখারী (১৬০৯)। মুসলিম (১২৬৭)

রুকনে ইয়ামানী ও হজরে আসওয়াদ বরাবর স্থানে তওয়াফের সময় এই দুআ পড়বেন: 'রব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ। ওয়া ক্বিনা আযাবান নার'। [হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন। আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। বাকারা: ২০১] আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই রোকনের মাঝে বলতে শুনেছি, ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ 'রব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ। ওয়া ক্বিনা আযাবান নার'। [বাকারা: ২০১] (১)

প্রত্যেক তওয়াফের সময় হজরে আসওয়াদ বরাবর অতিক্রম করার সময় পূর্বোক্ত কাজগুলো করবেন। মাত্র একবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবেন। একাধিক বার তাকবীর বলা, হজরে আসওয়াদ বরাবর এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা- এগুলোর কোনোটাই নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়। বরং এগুলো ভিড় সৃষ্টি করে। তওয়াফকারীদের কষ্টের কারণ হয়।

তওয়াফের অন্যান্য সময়গুলোতে যা ইচ্ছা দুআ, যিকির ও তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকবেন। কারণ বাইতুল্লাহর তওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ, জামারাতে পাথর নিক্ষেপ এই সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা(২)।

তবে কিছু তওয়াফকারীদেরকে দেখা যায় বিশেষ কোনো দুআ বা যিকির নির্ধারিত করে পুরোটা সময় কেবল সেটাই পড়তে থাকেন, কেউ আবার এসব নির্ধারিত দুআ সংবলিত বিভিন্ন পুস্তিকা হাতে ধরে সেগুলো পড়তে থাকেন- এগুলো সব নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। অবৈধ ও বিদআত। শরীয়তে এসবের কোনো প্রমাণ নেই। বরং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সকল কল্যাণের জন্য দুআ ও মুনাজাত করবেন। তওয়াফের মাঝে উপরের স্থান ও দুআগুলো বাদে নির্ধারিত কোনো বিশেষ দুআ বা যিকির নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা কিংবা কাজে এগুলোর কোনো প্রমাণ নেই। একইভাবে তওয়াফের আরেকটি ভুল হলো, সংঘবদ্ধভাবে একজন ব্যক্তির অধীনে তওয়াফ করা। সেই ব্যক্তি একটি দুআ পড়েন আর বাকি সবাই সেটা সমস্বরে সুউচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করেন। এতে বাইতুল্লাহর সামনে আওয়াজ উঁচু হয়। বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। অন্যান্য তওয়াফকারীদের ইবাদত এবং দুআ-মুনাজাতে বিঘ্নতা ঘটে। ইবাদতের খুশূ ও মনোযোগ বিনষ্ট হয়। এই নিরাপদ ও মহিমান্বিত স্থানে আল্লাহর মেহমানদের কষ্ট দেয়া হয়।

তওয়াফ বাইতুল্লাহর চারপাশে সাত বার প্রদক্ষিণের নাম। হজরে আসওয়াদ দিয়ে শুরু হয়ে হজরে আসওয়াদে এসেই সমাপ্ত হয়।

'হিজর' তথা হাতীমে ইবরাহীমের মাঝে তওয়াফ করা বিশুদ্ধ নয়। কারণ সেটা কাবার অংশ।

সাতবার প্রদক্ষিণ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হবেন। সেখানে: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗى﴾ 'ওয়াত্তাখিযূ মিন মাকামি ইবরাহীমা মুসল্লা' [তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো। বাকারা: ১২৫] এই আয়াত পাঠ করবেন। অতঃপর সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের কাছাকাছি স্থানে দুই রাকাআত সালাত আদায় করবেন। কাছে সম্ভব না হলে মাকামে ইবরাহীম বরাবর দূরে কোথাও পড়ে নিবেন। যাতে করে মাকামটা তার ও কাবার মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। এই দুই রাকাআত সালাতের প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে 'আল-কাফিরূন' পড়বেন। আর দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে 'ইখলাস' পড়বেন।

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। সেটা হলো, কিছু কিছু লোক প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝেও এই দুই রাকাআত সালাত মাকামে ইবরাহীমের খুব কাছাকাছি জায়গায় আদায় করে থাকেন। এতে তওয়াফকারীদের কষ্ট হয়। তাদের চলাচল বিঘ্নিত হয়। মাতাফে আরও বেশি ভিড়, ধাক্কাধাক্কি ও সংকীর্ণতা তৈরি

---

(১) আবু দাউদ (১৮৯২)। সুনানে কুবরা, নাসায়ী (৩৯২০)। মুসনাদে আহমদ (১৫৩৯৮)। সহীহ ইবনে খুযাইমা (২৭২১)। সহীহ ইবনে হিব্বান (৩৮২৬)

(২) আবু দাউদ (১৮৮৮)। তিরমিযী (৯০২)। মুসনাদে আহমদ (২৪৩৫১)। এই সবগুলো গ্রন্থে দুর্বল সনদে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'বাইতুল্লাহর তওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ, জামারাতে পাথর নিক্ষেপ এই সকল ইবাদত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিধেয় করা হয়েছে'। বর্ণনাটি আব্দুর রাযযাক তাঁর মুসান্নাফে (৫/৪৯) আয়েশা (রা.) এর বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন (রাসূলুল্লাহর বক্তব্য নয়)।

হয়। অথচ মাকাম বরাবর দূরে কাবার আঙিনাতে কিংবা মসজিদের ভেতরে যে কোনো জায়গায় এই সালাত আদায় করা যায়। বরং যে কোনো স্থানে এই দুই রাকাআত আদায় করা যায়। এর জন্য বিশেষ কোনো স্থানে পড়া শর্ত নয়।

একইভাবে আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। সেটা হলো মাকামে ইবরাহীম স্পর্শ করা। এতে নিজের শরীর, সন্তানদের শরীর লাগানো। এগুলো সব বিদআত ও নিষিদ্ধ বিভ্রান্তিমূলক কাজ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাকামে ইবরাহীম স্পর্শ করেছেন এই মর্মে কোনো বর্ণনা নেই। তিনি এর অনুমতিও দেননি। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকেও এমন কিছু প্রমাণিত নয়।

দুই রাকাআত সালাত শেষ করে হজরে আসওয়াদের দিকে ফিরে যাবেন। সম্ভব হলে সেটাকে স্পর্শ করবেন। নতুবা কিছুই করতে হবে না। দূর থেকে ইশারা করা যাবে না।

অতঃপর সাঈ করার স্থানে (মাসআ) সাঈর জন্য চলে যাবেন। সাফা পাহাড়ের কাছে পৌঁছলে এই আয়াত তিলাওয়াত করবেন: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ﴾ অর্থ: 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত'। [বাকারা: ১৫৮] সাঈ শুরুর আগে আয়াতটি উক্ত স্থানে একবারই পড়বেন। অন্যান্য বার পড়বেন না। অতঃপর সাফার ওপর আরোহণ করবেন যাতে সেখান থেকে কাবা দেখা যায়। তখন কাবামুখী হয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা করবেন এবং যা খুশি দুআ করবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত স্থানে এই দুআ করতেন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহ। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ। আনজাযা ওয়া'দাহ। ওয়া নাসারা আবদাহ। ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ'। ওপরের দুআটি তিনি তিন বার পড়তেন। এর মাঝে অন্যান্য দুআ করতেন[১]।

অতঃপর সাফা থেকে হেঁটে মারওয়ার দিকে যাবেন। সামান্য হাঁটলেই 'বাতনে ওয়াদী' নামক স্থানে পৌঁছবেন। বর্তমানে এটা হারামের অন্যান্য স্থানের মতোই অভিন্ন টাইলসে সুসজ্জিত। কিন্তু এর ছাদ সবুজ রঙয়ের বাতি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে সবুজ চিহ্নিত স্থানে পৌঁছলে পুরুষগণ যথাসম্ভব খুব দ্রুত হাঁটবেন। তবে অন্যের কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সবুজ বাতি চিহ্নিত ছাদ শেষ হয়ে গেলে আগের মতো স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবেন। এক পর্যায়ে মারওয়াতে পৌঁছে যাবেন। মারওয়ার ওপর আরোহণ করে কিবলামুখী হয়ে সাফার মতো দুআ করবেন।

অতঃপর মারওয়া থেকে অবতরণ করে সাফার দিকে হাঁটা শুরু করবেন। সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানে দ্রুত হাঁটবেন। বাকি পথ স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবেন। সাফাতে পৌঁছে গেলে কিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে প্রথম বারের মতো দুআ করবেন। পাহাড়ের দুআ ব্যতীত সাঈর পুরোটা সময় নিজের ইচ্ছা মতো যিকির, দুআ ও তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকবেন। তওয়াফের মতো সাঈতেও বিশেষ কোনো দুআ বা যিকির নেই যেমনটা কিছু মানুষকে করতে দেখা যায়। এগুলোর কোনোটাই প্রমাণিত নয়।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ, সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানে জোরে হাঁটা- এগুলো সব সুন্নাত। ওয়াজিব বা আবশ্যক নয়।

সাফা পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড়ে একবার গমন এক সাঈ হিসেবে বিবেচিত হয়। মারওয়া থেকে আবার সাফায় প্রত্যাবর্তন দ্বিতীয় সাঈ গণ্য হয়। এই হিসেবে সাঈর সূচনা হয় সাফা থেকে আর সমাপ্তি ঘটে মারওয়াতে। যখন এভাবে সাত সাঈ সম্পন্ন হবে পুরুষগণ মাথা মুণ্ডাবেন কিংবা চুল ছোট করে কেটে ফেলবেন। চুল কাটার চেয়ে কামিয়ে ফেলা উত্তম। তবে তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারীর ক্ষেত্রে হজ্জ যদি খুব নিকটবর্তী হয় এবং এই সময়ের মাঝে পর্যাপ্ত চুল গজানোর সম্ভাবনা না থাকে তবে তার ক্ষেত্রে না কামিয়ে বরং ছোট করা উত্তম। যাতে তিনি হজ্জের সময় কামাতে পারেন। এর প্রমাণ হলো, যখন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুলহজ্জের চতুর্থ তারিখে মক্কায় এসে পৌঁছেন তখন সাহাবীদেরকে প্রথমে বাইতুল্লাহ তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর নির্দেশ দেন। অতঃপর যাদের কাছে হাদী (কুরবানীর পশু) ছিল না তাদেরকে তিনি চুল ছোট করার মাধ্যমে হালাল হয়ে যেতে বলেন[২]।

---

(১) মুসলিম (১২১৮)

(২) বুখারী (১৫৪৫)। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীস।

মাথা মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডানো আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ অর্থ: '(তোমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে) মুণ্ডিত মস্তক ও কেশ কর্তিত অবস্থায়'। [ফাতাহ: ২৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করেছেন। প্রথমে ডান পাশ করেছেন অতঃপর বাম পাশ[১]। মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে বাকিটা রেখে দেয়া নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়।

চুল ছোট করার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ মাথার চুল ছোট করতে হবে।

আর নারীদের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় চুল ছোট করতে হবে। তাদের জন্য মাথার চুল কামিয়ে ফেলা বৈধ নয়। তারা চুল বেণী করে এক কড় পরিমাণ কেটে ফেলবেন। অন্য কথায়, যদি মাথায় খোঁপা থাকে তাহলে খোঁপার অগ্রভাগ থেকে এক কড় কাটবেন। আর যদি খোঁপার পরিবর্তে বেণী করা থাকে তবে প্রত্যেক বেণীর অগ্রভাগ থেকে এক কড় কাটবেন।

এভাবে উমরা সম্পন্ন হবে এবং উমরাকারী সম্পূর্ণ হালাল গণ্য হবেন। তখন তার জন্য ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সবকিছুর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবে হালাল হয়ে যাবে।

উমরার কার্যাবলীর সারকথা:

১- ফরজ গোসলের মতো গোসল করা ও সুগন্ধি মাখা।

২- ইহরামের কাপড় পরা। পুরুষের ক্ষেত্রে লুঙ্গি ও চাদর। নারীর ক্ষেত্রে যে কোনো বৈধ পোশাক।

৩- তওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ।

৪- সাতবার বাইতুল্লাহর চারপাশে তওয়াফ। যা হজরে আসওয়াদ থেকে শুরু হয়ে সেখানে এসেই শেষ হবে।

৫- মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাআত সালাত আদায়।

৬- সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাত বার সাঈ। যা সাফা দিয়ে শুরু হয়ে মাওয়াতে গিয়ে শেষ হবে।

৭- পুরুষের জন্য মাথা কামানো কিংবা চুল ছোট করা। নারীদের ক্ষেত্রে চুল সামান্য কাটা।

---

(১) মুসলিম (১৩০৫)। আনাস ইবনে মালেক (রা.) এর হাদীস।

দশম অধ্যায়: হজ্জের রোকন ও ওয়াজিবসমূহ

হজ্জের রোকনসমূহ:

হজ্জের রোকন যা ছাড়া হজ্জ বিশুদ্ধ হবে না এমন বিষয় চারটি।

১- ইহরাম বাঁধা। এটা মূলত হজ্জে প্রবেশের নিয়ত। আর নিয়তের স্থান হলো হৃদয়। ফলে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা শরীয়তসিদ্ধ নয়। তাই এভাবে বলা যাবে না, 'হে আল্লাহ আমি নিজের পক্ষ থেকে কিংবা অমুকের পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করলাম'। বস্তুত নিয়ত ছাড়া কোনো কাজই শুদ্ধ হয় না। এর প্রমাণ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, 'সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে সে তা-ই পাবে'[১]।

হজ্জে ইহরাম বাঁধার সময়: শাওয়াল মাসের শুরু থেকে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার সময় শুরু হয়। ফলে রমজানের শেষ দিনের সূর্যাস্তের পর থেকে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা শুদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ অর্থ: 'হজ্জের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ্জ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজ্জে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়'। [বাকারা: ১৯৭] আর হজ্জের মাসগুলো হলো: শাওয়াল, যুলকা'দ ও যুলহজ্জের প্রথম দশদিন।

ইহরাম নির্ধারিত পাঁচটি মীকাতের যে কোনো একটি থেকে বাঁধতে হবে। পেছনে এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

২- আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ﴾ অর্থ: 'অতঃপর যখন তোমরা (তওয়াফে ইফাজার জন্য) ফিরে আসবে আরাফা থেকে, তখন মাশআরে-হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ করো'। [বাকারা: ১৯৮] আব্দুর রহমান ইবনে ইয়া'মার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে ছিলাম। তখন কিছু লোক এসে তাঁকে হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বলেন, 'হজ্জ হলো আরাফা। সুতরাং যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে সূর্যোদয়ের সামান্য সময় পূর্বেও আরাফায় যাবে তার হজ্জ পূর্ণ হবে'[২]। [অর্থাৎ কুরবানীর দিনের সূর্য উঠার আগে আগে যদি কেউ আরাফাতে গিয়ে না পৌঁছায় তবে তার হজ্জ হবে না]

আরাফায় অবস্থানের সময়: যুলহজ্জ মাসের নয় তারিখ সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে আরাফায় অবস্থানের সময় শুরু হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য ঢলে পড়ার পরেই আরাফাতে গিয়েছেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন সূর্য ঢলে পড়ে গেলো তখন রাসূলুল্লাহর উষ্ট্রী প্রস্তুত করা হলো। তিনি তাতে চড়ে 'বাতনে ওয়াদী'তে পৌঁছলেন। মানুষের মাঝে খুতবা দিলেন। অতঃপর উটে চড়ে তাঁর অবস্থানস্থলে এলেন'[৩]। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর ছেলে সালেম সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, '(খলীফা) আব্দুল মালিক (তার গভর্নর) হাজ্জাজের কাছে চিঠি লিখে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন হজ্জে ইবনে উমরের বিরোধিতা না করেন। ইবনে উমর আরাফার দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে হাজ্জাজের তাঁবুর কাছে এসে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হাজ্জাজ একটি হলুদ রঙয়ের চাদর পরে বের হয়ে বললেন, 'আব্দুর রহমান! কী খবর'!? তিনি বললেন, 'যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাও তবে এখনই চলো'। হাজ্জাজ বললেন, 'এই মুহূর্তে'? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। হাজ্জাজ বললেন, 'একটু সময় দিন। মাথায় একটু পানি ঢেলে আসি'। তিনি অপেক্ষা করলেন। অতঃপর হাজ্জাজ বের হয়ে এলেন। আমরা চলতে শুরু করলাম। হাজ্জাজ

---

(১) বুখারী (১)। মুসলিম (১৯০৭)

(২) আবু দাউদ (১৯৪৯)। তিরমিযী (৮৮৯)। নাসায়ী (৩০১৬)। ইবনে মাজাহ (৩০১৫)

(৩) মুসলিম (১২১৮)

ছিলেন আমার ও পিতার মাঝে। আমি তাকে বললাম, যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তবে খুতবা সংক্ষিপ্ত করবেন। (আরাফায়) আগে আগে অবস্থানের চেষ্টা করবেন'। আমার কথা শুনে তিনি ইবনে উমরের দিকে তাকালেন। (পিতা) ইবনে উমর বললেন, 'সে সত্য বলেছে'[১]।

আরাফায় অবস্থানের শেষ সময়: আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে আরাফায় অবস্থানের সর্বশেষ সময় হলো দশম তারিখ তথা কুরবানীর দিনের সূর্যোদয়। ফলে সূর্য উঠে গেলে আর আরাফায় অবস্থানের সুযোগ নেই[২]। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়া'মারের হাদীস এর প্রমাণ। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে ছিলাম। তখন কিছু লোক এসে তাঁকে হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বলেন, 'হজ্জ হলো আরাফা। সুতরাং যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে সূর্যোদয়ের সামান্য সময় পূর্বেও আরাফায় গেলো তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেলো'[৩]।

অবস্থানস্থল: আরাফার ময়দানের পুরোটাই মাশআরের অন্তর্ভুক্ত। ফলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করা যাবে। হাজী আরাফার যেখানেই অবস্থান করেন হজ্জ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমি এখানে অবস্থান করেছি। আরাফার সর্বত্র অবস্থান করা যায়'[৪]।

৩- তওয়াফে ইফাজা: এটা 'তওয়াফে হজ্জ' (হজ্জের তওয়াফ) এবং 'তওয়াফে যিয়ারত' নামেও পরিচিত। কাবাঘর তওয়াফের মাধ্যমে এটা সম্পন্ন হয়। এটা হজ্জের রোকন হবার দলীল কুরআনের আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ অর্থ: 'আর তারা যেন এই প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে'। [হজ্জ: ২৯] আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'তওয়াফে ইফাজা করার পরে সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই হায়েজগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে সাফিয়্যাহর কথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, 'সে কি আমাদেরকে আটকে রাখবে'? আয়েশা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তওয়াফে ইফাজা সম্পন্ন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তবে সে রওয়ানা হতে পারে'[৫]।

উপর্যুক্ত বর্ণনায় রাসূলুল্লাহর বক্তব্য 'সে কি আমাদেরকে আটকে রাখবে'- প্রমাণ করে তওয়াফে ইফাজা হজ্জের রোকন। এটা ছাড়া হজ্জ সম্পন্ন হবে না। নতুবা এটাকে তিনি মক্কাতে আটকে থাকা ও মদীনায় ফিরে যেতে না পারার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করতেন না। অতঃপর আয়েশা (রা.) যখন জানালেন যে, সাফিয়্যাহ ঋতুস্রাবের আগেই তওয়াফে ইফাজা সম্পন্ন করে ফেলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সফরের অনুমতি দিয়ে দিলেন।

তওয়াফে ইফাজার সময়: আরাফার ময়দানে অবস্থান ও মুযদালিফায় রাত যাপনের পর থেকে শুরু হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ অর্থ: 'এরপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে ও তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের'। [হজ্জ: ২৯] আর আরাফায় অবস্থান ও মুযদালিফায় রাত যাপনের আগে অপরিচ্ছন্নতা দূর ও মানত পূর্ণ হয় না। তওয়াফে ইফাজার শুরু সময় হলো দশ তারিখের মধ্যরাত অতিবাহিত হবার পরে। এই শর্তে যে উক্ত ব্যক্তি মুযদালিফায় রাতের কিছু সময় কাটিয়েছে।

তবে সুন্নাত হলো দশ তারিখ তথা ঈদের দিন সকালে তওয়াফ করা। তওয়াফে ইফাজার সর্বশেষ কোনো সময় নির্ধারিত নেই। ফলে যুলহজ্জের বারো, তেরো কিংবা চৌদ্দ যে কোনো তারিখে কোনো অসুবিধা ছাড়া এই তওয়াফ করা যেতে পারে।

---

(১) বুখারী (১৬৬০)

(২) আল-ইসতিযকার, ইবনে আব্দিল বার (৪/২৮০)। মুগনী, ইবনে কুদামা (৫/২৭৪)

(৩) আবু দাউদ (১৯৪৯)। তিরমিযী (৮৮৯)। নাসায়ী (৩০১৬)। ইবনে মাজাহ (৩০১৫)

(৪) মুসলিম (১২১৮; ১৪৯)

(৫) বুখারী (৪৪০১)। মুসলিম (১২১১)

৪- সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ﴾ অর্থ: 'নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ (সাঈ) করাতে কোন দোষ নেই'। [বাকারা: ১৫৮] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'অতঃপর নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তারউইয়াহর দিন (তথা যুলহজ্জের অষ্টম তারিখ) আমরা হজ্জের ইহরাম বাঁধি। যাবতীয় কাজ শেষ করে যেন আমরা বাইতুল্লাহ তওয়াফ করি। সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ সম্পন্ন করি। এটুকু করলে আমাদের হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। আমাদেরকে কুরবানী করতে হবে'[১]। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দু'টোর মাঝে প্রদক্ষিণ (তথা সাঈ) করতে বলেছেন। সুতরাং কারও জন্য এই দু'টোর মাঝে প্রদক্ষিণ পরিত্যাগ করা বৈধ নয়'[২]। অপর বর্ণনায় এসেছে আয়েশা (রা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ (তথা সাঈ) করবে না আল্লাহ তার হজ্জ কিংবা উমরা পূর্ণ করবেন না'[৩]।

সাঈর সময়: 'ক্বিরান' ও 'ইফরাদ' হজ্জ আদায়কারীর ক্ষেত্রে সাঈর সময় শুরু হবে তওয়াফে কুদূম তথা আগমনী তওয়াফের পর থেকে। সুতরাং তাদের তওয়াফে কুদূমের পরে আরাফা দিবসের আগেই সাঈ করে ফেলা উচিত। তবে আরাফা দিবসের পরেও করা বৈধ। সেক্ষেত্রে তওয়াফে ইফাজার পরে সাঈ করবেন।

আর 'তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারীর ক্ষেত্রে সাঈর সূচনা হবে আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফায় রাত যাপন ও তওয়াফে ইফাজার পরে। সুতরাং তারা তওয়াফে ইফাজার পরে সাঈ করবেন। এক্ষেত্রে সুন্নাত হলো দশ তারিখ সকালে তওয়াফে ইফাজা সম্পন্নের পরে সাঈ করে ফেলা।

সাঈর সর্বশেষ সময়ের ব্যাপারে পূর্বোক্ত তওয়াফে ইফাজার কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ এর সর্বশেষ সময় নির্ধারিত নয়।

সতর্কতা: সাঈর ক্ষেত্রে শর্ত হলো এর আগে যে কোনো তওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে। সুতরাং তওয়াফে কুদূম, তওয়াফে ইফাজা কিংবা বিদায়ী তওয়াফ যে কোনো একটা করে এরপর সাঈ শুরু করতে হবে। কেউ যদি কোনো প্রকারের তওয়াফ ছাড়া প্রথমেই সাঈ করে তবে তার সাঈ শুদ্ধ হবে না। বাতিল গণ্য হবে।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ:

হজ্জের ওয়াজিব সর্বমোট সাতটি। যথা:

১- শরীয়ত নির্ধারিত মীকাতগুলো থেকে ইহরাম বাঁধা। এর দলীল আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে আপনি কোথা থেকে ইহরামের নির্দেশ দেন? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'মদীনাবাসী যুল হুলাইফা থেকে, শামবাসী জুহফা থেকে, নজদবাসী 'ক্বরন' থেকে ইহরাম বাঁধবে'[৪]। অপর বর্ণনায় এসেছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনাবাসীদেরকে যুল হুলাইফা থেকে, শামবাসীদেরকে জুহফা থেকে আর নজদবাসীদেরকে 'ক্বরন' থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন[৫]। যায়দ ইবনে জুবাইর থেকে একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর কাছে আসেন। তখন তার জন্য তাঁবু ও চাঁদোয়া টানানো হয়েছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথা থেকে উমরার (ইহরাম বাঁধা) বৈধ? তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নজদবাসীদের জন্য 'ক্বরন' (করনুল মানাযিল), মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলাইফা ও শামবাসীদের জন্য জুহফাকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন'[৬]।

---

(১) বুখারী (১৫৭২)

(২) বুখারী (১৬৪৩)। মুসলিম (১২৭৭)

(৩) বুখারী (১৭৯০)। মুসলিম (১২৭৭)

(৪) বুখারী (১৩৩)। মুসলিম (১১৮২)। উপরের ভাষ্য বুখারীর।

(৫) মুসলিম (১১৮২; ১৫)

(৬) বুখারী (১৫২২)

২- আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। দিনের বেলা অবস্থানকারীদের সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেছেন। দুর্বলদেরকেও তিনি সূর্যাস্তের আগে আরাফা ত্যাগের অনুমতি দেননি। কিন্তু মুযদালিফা আগে আগে ত্যাগের অনুমতি দিয়েছেন। অথচ প্রয়োজন দু'টো জায়গাতেই সমান। বোঝা গেলো, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা আবশ্যক। যাতে ওখানে রাত ও দিন দু'টোই পাওয়া যায়। আর যদি কেউ দিনে অবস্থান না করে কেবল রাতে এসে পৌঁছায় তবে ন্যূনতম পরিমাণ হিসেবে সামান্য সময় অবস্থানই যথেষ্ট হবে। এজন্য তাকে কিছু করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'হজ্জ হলো আরাফা। সুতরাং যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতের সূর্যোদয়ের সামান্য সময় পূর্বেও আরাফায় যাবে তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে'(১)।

৩- মুযদালিফায় রাত যাপন করা। সুতরাং কুরবানীর ঈদের রাতটি মুযদালিফায় কাটাতে হবে। যারা মধ্যরাতের আগেই সেখানে পৌঁছবেন তারা মধ্যরাতের পর পর্যন্ত সেখানে থাকবেন। আর যদি কেউ মধ্যরাতের পরে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন তবে সামান্য সময় সেখানে থাকাই যথেষ্ট হবে। এরপর সেখান থেকে চলে যাবেন।

মুযদালিফায় রাত যাপনের আবশ্যকীয়তা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ﴾ অর্থ: 'অতঃপর যখন তোমরা ফিরে আসবে আরাফা থেকে, তখন মাশআরে-হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ করো'। [বাকারা: ১৯৮] মুযদালিফায় রাত যাপনের সময়-সীমা ফজর পর্যন্ত। এটা উরওয়া ইবনে মুযাররিস আত-তাঈর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে (মুযদালিফাতে) এই (ফজর) সালাত পেলো, এর পূর্বে দিনে বা রাতে আরাফায় উপস্থিত হতে পারলো, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সে সকল আবশ্যকীয় কাজ সম্পন্নকারী সাব্যস্ত হবে'(২)।

দুর্বল ও অপারগদের জন্য ফজরের আগেই মুযদালিফা ত্যাগের অনুমতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এমন অনুমতি দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে মালপত্র নিয়ে রাতেই মুযদালিফা থেকে পাঠিয়ে দেন'(৩)। আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) এর মাওলা (আজাদকৃত দাস) আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'আসমা (রা.) মুযদালিফার রাতে সেখানে অবস্থান করেন। রাতে উঠে সালাত আদায় করেন। কিছু সময় সালাত আদায়ের পরে বলেন, 'বৎস! চাঁদ ডুবে গেছে'? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তবে সফর শুরু করো'। তখন আমরা মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হয়ে জামরাতে চলে এলাম। তিনি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর ফিরে এসে নিজ অবস্থানস্থলে ফজরের সালাত আদায় করলেন। আমি বললাম, 'আমরা সম্ভবত অন্ধকার থাকতে (আগে আগেই) সব করে ফেলেছি। তিনি বললেন, 'বৎস! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদেরকে এমন অনুমতি দিয়েছেন'(৪)। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর পুত্র সালেম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তাঁর পরিবারের দুর্বলদেরকে আগে পাঠিয়ে দিতেন। তারা রাতে মুযদালিফার 'মাশআরে হারাম' এর কাছে অবস্থান করতেন। সেখানে যিকির-আযকারে ব্যস্ত থাকতেন। অতঃপর বাকি সবার আগেই মুযদালিফা থেকে বেরিয়ে যেতেন। তাদের কেউ কেউ মিনাতে ফজরের সালাত আদায় করতেন। আর কেউ আরেকটু পরে আসতেন। অতঃপর জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করতেন। ইবনে উমর (রা.) বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে (তথা দুর্বল ও বৃদ্ধদেরকে) এমন অনুমতি দিয়েছেন'(৫)।

তবে স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্নাত হলো ফজর পর্যন্ত মুযদালিফাতে অবস্থান করা। সেখানে ফজরের সালাত আদায় করা। সূর্যের আলো স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকা। এটা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমল যেমনটা সামনে বর্ণনা করা হবে।

---

(১) জামে' তিরমিযী (৮৮৯)

(২) আবু দাউদ (১৯৫০)। তিরমিযী (৯০৬)। নাসায়ী (৩০৩৯)। ইবনে মাজাহ (৩০১৬)

(৩) বুখারী (১৮৫৬)। মুসলিম (১২৯৩)

(৪) বুখারী (১৬৭৯)। মুসলিম (১২৯১)

(৫) বুখারী (১৬৭৬)। মুসলিম (১২৯৫)

৪- ঈদের দিন কেবল জামরায়ে আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা। তাশরীকের দিনগুলোতে তিন জামরাতে নির্ধারিত সময়ে কংকর নিক্ষেপ করা। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের আমল এটা ওয়াজিব হবার প্রমাণ। কারণ তিনি কুরবানী ও তাশরীকের দিনগুলোতে জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করেছেন। আর তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের আমলগুলো শিখে নাও'(১)।

৫- পুরুষের ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছোট করা। আর নারীর ক্ষেত্রে কেবল ছোট করা। এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, যখন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় এসে পৌঁছেন তখন সাহাবীদেরকে প্রথমে বাইতুল্লাহ তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর নির্দেশ দেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছোট করার মাধ্যমে হালাল হয়ে যেতে বলেন(২)। একইভাবে জাবের (রা.) এর হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর তওয়াফ করে চুল ছোট করার মাধ্যমে হালাল হয়ে যান(৩)। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীসের এসেছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'নারীদের জন্য মাথা মুণ্ডানোর বিধান নেই। তারা কেবল চুল ছোট করবে'(৪)।

৬- আইয়্যামের তাশরীকের রাতগুলো মিনায় কাটানো। যারা দ্রুত ফিরে আসবে তাদের জন্য এটা যুলহজ্জের এগারো ও বারো তারিখের রাত। আর যারা দেরি করবে তাদের এই দুই রাতের সঙ্গে তেরো তারিখের রাতও সেখানে থাকতে হবে। এটা ওয়াজিব হবার প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) হাজীদেরকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনার রাতগুলো মক্কায় কাটানোর জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন(৫)। মিনায় রাত কাটানো যদি ওয়াজিব না হতো তবে আব্বাস (রা.) সেজন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে অনুমতি চাইতেন না। একইভাবে রাসূলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল তার জন্য অনুমতি দিতেন না। উপরন্তু উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'মিনার রাতগুলো কোনো হাজী যেন আকাবার বাইরে না কাটায়'(৬)।

৭- বিদায়ী তওয়াফ করা। হায়েজ ও নেফাসগ্রস্ত নারীদের জন্য এটা ওয়াজিব নয়। ফলে তারা বিদায়ী তওয়াফ করবেন না। এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন, 'মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তাদের সর্বশেষ মুহূর্তগুলো বাইতুল্লাহতে কাটে। তবে হায়েজগ্রস্ত নারীদের ক্ষেত্রে এই বিধানে ছাড় দেয়া হয়েছে'(৭)। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, 'এক সময় মানুষ ইচ্ছামতো (হজ্জ থেকে) ফিরে আসতো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক হাজীর সর্বশেষ সময় যেন বাইতুল্লাহতে কাটে (তথা তওয়াফ করে)(৮)।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো হলো হজ্জের ওয়াজিব তথা আবশ্যক অংশ। প্রত্যেক হাজীকে এগুলো যথানিয়মে পালন করতে হবে। যদি কেউ এগুলোর কোনোটা ছেড়ে দেয় তবে তাকে একটি ছাগল অথবা উট বা গরুর এক সপ্তমাংশ ফিদইয়া হিসেবে দিতে হবে। মক্কাতে জবাই করে সেগুলো দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিবে।

এগুলোর বাইরে হজ্জের অন্যান্য বিধি-রীতি যথা তওয়াফে কুদূম বা আগমনী তওয়াফ, তারউইয়াহ তথা অষ্টম তারিখে মিনায় গমন, সেখানে আরাফার রাত যাপন, তওয়াফের সময় 'ইযতিবা' ও 'রমল' করা, হজরে আসওয়াদ চুম্বন, যিকির, দুআ, সাফা ও মারওয়াতে আরোহণ ইত্যাদি- যা সবিস্তারে সামনে বর্ণনা করা হবে- এই সবগুলো হজ্জের সুন্নাত। প্রত্যেক হাজীর সেগুলোও যথাসাধ্য যত্নের সঙ্গে পালন করা কর্তব্য।

---

(১) মুসলিম (১২৯৭)

(২) বুখারী (১৭৩১)

(৩) বুখারী (১৬৫১)

(৪) আবু দাউদ (১৯৮৫)। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, 'এটার সনদ হাসান পর্যায়ের'। দেখুন: বুলূগুল মারাম (২২২)

(৫) বুখারী (১৬৩৪)। মুসলিম (১৩১৫)

(৬) মুয়াত্তা মালেক (আবু মুসআব যুহরীর বর্ণনা: ১৪১০)

(৭) বুখারী (১৭৫৫)। মুসলিম (১৩২৮)

(৮) মুসলিম (১৩২৭)

একাদশ অধ্যায়: হজ্জের বিবরণ

হজ্জের সূচনা: হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা

'ইয়াওমুত তারউইয়াহ' তথা যুলহজ্জের অষ্টম তারিখ সকালে হজ্জের নিয়তকারীগণ হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। এই সময় যিনি মক্কাতে থাকবেন তিনি নিজস্ব স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবেন। হোক সেটা মক্কার ভেতরে কিংবা সামান্য একটু দূরের কোনো স্থানে।

ইহরাম বাঁধার জন্য মসজিদে হারাম কিংবা অন্য কোনো মসজিদে গমন সুন্নাত নয়। কারণ এধরনের কোনো আমল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত নয়।

বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে থাকা সাহাবীদের মাঝে যারা তামাত্তু' হজ্জ করেছেন তাদের সকলে নিজস্ব স্থান তথা 'আবতাহ' থেকে ইহরাম বেঁধেছেন। তারা ইহরাম বাঁধার জন্য বিশেষ কোনো স্থানে গমন করেননি। আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন আমরা (মক্কার উপকণ্ঠে) পৌঁছলাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদেরকে হালাল হবার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তারউইয়াহর দিন সকলে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধেন[১]।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদেরকে বলেন, 'তোমরা বাইতুল্লাহর তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ ও চুল কাটার মাধ্যমে হালাল হয়ে যাও। অতঃপর হালাল অবস্থায় থাকো। যুলহজ্জের অষ্টম তারিখ হজ্জের ইহরাম বাঁধো। আর যে ইহরাম বেঁধে এসেছো সেটাকে তামাত্তু' হজ্জের উমরা বানিয়ে নাও'[২]।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে আরও বর্ণিত তিনি বলেন, হালাল হওয়ার পরে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে মিনার দিকে যাওয়ার সময় ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। তখন আমরা 'আবতাহ' থেকে ইহরাম বাঁধলাম[৩]।

উক্ত ইহরামের সময়ও তাই করতে হবে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার সময় যা করা হয়। ফলে গোসলের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা অর্জন, সেলাইবিহীন কাপড় বর্জন, শর্ত রাখা, সুগন্ধি ব্যবহার, দুই রাকাআত সালাত আদায়ের মাধ্যমে ইহরাম বাঁধতে হবে যেমনটা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। তবে এটা যেহেতু হজ্জের ইহরাম তাই 'লাব্বাইকা উমরাতান' এর পরিবর্তে 'লাব্বাইকা হাজ্জান' বলতে হবে।

মিনায় গমন:

অষ্টম তারিখ নিজস্ব স্থানে ইহরাম বাঁধার পরে করণীয় হলো মিনায় যাওয়া। যদি হাজী মিনাতেই থাকেন তবে সেখানেই অবস্থান করবেন। আর যদি মিনার বাইরে থাকেন তবে সুন্নাত হলো, যোহরের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া। অতঃপর সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করবেন। প্রত্যেক ওয়াক্তের সালাত নিজস্ব ওয়াক্তেই পড়বেন। কিন্তু 'কসর' করবেন। দিবাগত রাত- যা মূলত আরাফার রাত- মিনাতেই যাপন করবেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'তারউইয়াহ তথা অষ্টম তারিখ সাহাবাগণ মিনার ময়দানে গিয়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওয়ারীর পিঠে করে সেখানে যান এবং যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করেন। এর সামান্য সময় পরেই সূর্য উঠে যায়'[৪]।

আরাফায় অবস্থান:

নবম তারিখের সূর্য উদয়ের পরে মিনা থেকে আরাফার দিকে যাত্রা শুরু করবেন। সম্ভব হলে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত নামিরাতে অবস্থান করবেন। আর যদি সেটা সম্ভব না হয় সমস্যা নেই। কারণ নামিরাতে অবস্থান সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। চাইলে পূর্বের রাতেও আরাফার ময়দানে চলে যাওয়া যায়।

---

(১) বুখারী (১৫৫১)

(২) বুখারী (১৫৬৮)। মুসলিম (১২১৬)

(৩) মুসলিম (১২১৪)

(৪) মুসলিম (১২১৪)

সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে ইমাম সাহেব হাজীদের উদ্দেশে খুতবা প্রদান করবেন। এটা আরাফার খুতবা নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর তিনি মুসল্লীদেরকে নিয়ে যোহর ও আসরের সালাত একত্রে ও কসর আদায় করবেন। যোহরের দুই রাকাআত আর আসরের দুই রাকাআত পড়বেন। যেসব হাজীরা উক্ত জামায়াতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না তারা আরাফায় নিজ নিজ স্থানে নিজেরা জামায়াত করে পড়বেন।

সালাতের পরে হাজীগণ দুআ, যিকির, আল্লাহ তাআলার হামদ-সানাতে ডুবে যাবেন। যদি পাথুরে ভূমির কাছে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবস্থানস্থলে অবস্থান করা যায় তবে সবচেয়ে উত্তম। নুতবা যে কোনো জায়গায় অবস্থান করতে পারেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য নামিরায় পশমের তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি নিজেও রওয়ানা হলেন....। আরাফায় পৌঁছে দেখতে পেলেন নামিরাতে তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। তখন তিনি সেখানে অবস্থান করেন। সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে তিনি কাসওয়া (নামক) উষ্ট্রী প্রস্তুতের নির্দেশ দেন। অতঃপর সেটার পিঠে চড়ে 'বাতনে ওয়াদী'তে আগমন করেন। মানুষের উদ্দেশে খুতবা প্রদান করেন...। অতঃপর আযান ও ইকামত হয়। তিনি যোহরের সালাত আদায় করেন। অতঃপর আবার ইকামত দেয়া হয় এবং আসরের সালাত আদায় করেন। দু'টোর মাঝে আর কোনো সালাত আদায় করেননি। অতঃপর তিনি কাসওয়ার পিঠে চড়ে অবস্থানস্থলে আসেন। এখানে এসে তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়ার পেট পাথরের দিকে রাখেন। আর মানুষের চলার পথ নিজের সামনে রেখে কিবলামুখী হন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবেই অবস্থান করেন। সূর্যের হলুদাভা মিশে যেতে যেতে এক সময় সূর্য গোলক অদৃশ্য হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসামাকে নিজের পেছনে আরোহণ করালেন। অতঃপর পথ চলতে শুরু করলেন[১]।

আরাফার ময়দানের পাহাড় (জাবালে আরাফাতের) ওপর ওঠা সুন্নাত নয়। স্মর্তব্য যে, বর্তমানে কিছু মানুষকে না জেনে এই পাহাড়ে ওঠাকে সওয়াবের কাজ মনে করতে দেখা যায়, উপরন্তু তারা সেখানে গিয়ে পাথর ও পাহাড় স্পর্শ করে বরকত নেন কিংবা পাহাড়ের ওপরে বিদ্যমান স্তম্ভের ব্যাপারে নানা রকম অদ্ভূত বিশ্বাস রাখেন। এগুলো সব গর্হিত বিদআত ও ভ্রষ্টতা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এমন কিছুই প্রমাণিত নয়। সুতরাং হাজীর জন্য এধরনের গর্হিত কাজ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

আরাফার পুরো অঞ্চল অবস্থানযোগ্য। ফলে হাজী সাহেব যে কোনো স্থানে অবস্থান করলেই হজ্জ বিশুদ্ধ হবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমি এখানে অবস্থান করেছি। আরাফার সর্বত্র অবস্থান করা যায়'[২]।

তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, অবস্থানটা যেন আরাফার সীমারেখার ভেতরে হয়। বর্তমানে আরাফার চতুর্দিকে সীমানা নির্ধারণী চিহ্ন রয়েছে ফলে এগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। যারা সেটা না চিনবেন অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবেন। কারণ আরাফার সীমারেখার বাইরে অবস্থান করলে সব কষ্ট বৃথা যাবে। হজ্জ বিশুদ্ধ হবে না। আরাফার ময়দানে অবস্থান হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফলে হাদীসে আরাফাকেই হজ্জ বলা হয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়া'মার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে ছিলাম। তখন কিছু লোক এসে তাঁকে হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বলেন, 'হজ্জ হলো আরাফা। সুতরাং যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে সূর্যোদয়ের সামান্য সময় পূর্বেও আরাফায় যাবে তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে'। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে তার পেছনে উঠালেন। তিনি সেটা ঘোষণা দিতে লাগলেন[৩]।

কুরআন-সুন্নাহর কিছু শ্রেষ্ঠ দুআ সংকলন:

আরাফার ময়দানে দুই হাত তুলে দুআ করা সুন্নাত। উসামা ইবনে যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আরাফার ময়দানে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেছনে আরোহী ছিলাম। এক পর্যায়ে

---

(১) মুসলিম (১২১৪)

(২) মুসলিম (১২১৮; ১৪৯)

(৩) আবু দাউদ (১৯৪৯)। তিরমিযী (৮৮৯)। নাসায়ী (৩০১৬)। ইবনে মাজাহ (৩০১৫)

তিনি দুই হাত তুলে দুআ করতে লাগলেন। তাঁর উষ্ট্রী এক দিকে কাত হয়ে গেলো এবং লাগাম পড়ে গেলো। তখন তিনি সেটা এক হাত দিয়ে ধরলেন আর অন্য হাত উঁচু করে ধরে দুআ অব্যাহত রাখলেন'[১]।

নিচে কুরআন-সুন্নাহ থেকে নির্বাচিত কিছু দুআ তুলে ধরা হলো:

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ অর্থ: 'হে প্রভু! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও। পরকালে কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও'। [বাকারা: ২০১]

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦﴾ অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করো'। [বাকারা: ২৮৬]

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ٨﴾ অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! হিদায়াত দেয়ার পরে আমাদের হৃদয়গুলো বক্র করে দিও না। আর আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করো। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা'। [আলে ইমরান: ৮]

﴿رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦﴾ অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো'। [আলে ইমরান: ১৬]

﴿رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٗ طَيِّبَةًۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٨﴾ অর্থ: 'হে প্রভু! আমাকে তোমার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা কবুলকারী'। [আলে ইমরান: ৩৮]

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤٧﴾ অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের অপরাধ ও আমাদের সীমালঙ্ঘনকে ক্ষমা করো। আমাদেরকে অবিচল রাখো। কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো'। [আলে ইমরান: ১৪৭]

﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ ١٩٤﴾ অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনো; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! তাই আমাদের সকল গোনাহ মাফ করো এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের

(১) আহমদ (২১৮২১)। নাসায়ী (৩০১১)। ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে (১১/১৪২) বলেন, 'নাসায়ী এটা উৎকৃষ্ট সনদে বর্ণনা করেছেন'।

পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না'। [আলে ইমরান: ১৯৩-১৯৪]

﴿رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٢٣﴾ অর্থ: 'প্রভু আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। যদি তুমি ক্ষমা ও অনুগ্রহ না করো তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো'। [আ'রাফ: ২৩]

﴿حَسۡبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ١٢٩﴾ অর্থ: 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করলাম। আর তিনি মহান আরশের অধিপতি'। [তাওবা: ১২৯]

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ٣٥﴾ অর্থ: 'হে প্রভু! এই শহরকে নিরাপদ করো। আমি ও আমার বংশধরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করো'। [ইবরাহীম: ৩৫]

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ٤١﴾ অর্থ: 'প্রভু! আমাকে ও আমার বংশধরকে সালাত কায়েমকারী বানাও। প্রভু! আমার দুআ কবুল করো। প্রভু! আমাকে, আমার মাতা-পিতা ও মুমিনদেরকে হিসাব দিবসে ক্ষমা করে দাও'। [ইবরাহীম: ৪০-৪১]

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا ١٠﴾ অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করো। এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করো'। [কাহাফ: ১০]

﴿رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي ٢٥ وَيَسِّرۡ لِيٓ أَمۡرِي ٢٦﴾ অর্থ: 'প্রভু! আমার হৃদয় খুলে দাও। আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও'। [ত্বহা: ২৫-২৬]

﴿رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ١١٤﴾ অর্থ: 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও'! [ত্বহা: ১১৪]

﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧﴾ অর্থ: 'আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র। আমি জালিম'। [আম্বিয়া: ৮৭]

﴿رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ٨٩﴾ অর্থ: 'হে প্রভু! আমাকে একাকী ছেড়ে দিও না। নিশ্চয়ই তুমি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী'। [আম্বিয়া: ৮৯]

﴿رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنۡ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ٩٧ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحۡضُرُونِ ٩٨﴾ অর্থ: 'প্রভু! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তোমার পানাহ চাই। আমি আমার কাছে শয়তানের উপস্থিতি থেকে তোমার আশ্রয় চাই'। [মুমিনূন: ৯৭-৯৮]

﴿رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ٦٦﴾ অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা'। [ফুরকান: ৬৫-৬৬]

﴿ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ অর্থ: ‘হে প্রভু! আমাদেরকে চোখ শীতলকারী স্ত্রী ও সন্তান দান করো। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দাও’। [ফুরকান: ৭৪]

﴿ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٩﴾ অর্থ: ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি যে অনুগ্রহ দান করেছ তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমাকে শক্তি দান করো। আর যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আর তোমার দয়ায় আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো’। [নামল: ১৯]

﴿رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٥﴾ অর্থ: ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে আর আমার পিতা-মাতাকে যে নিয়ামত দান করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান করো, আর আমাকে এমন সৎকর্ম করার সামর্থ্য দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। আমি অনুশোচনাভরে তোমার দিকে ফিরে আসছি। আর আমি অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত’। [আহকাফ: ১৫]

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আর আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করো যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বড়ই করুণাময়, অতি দয়ালু’। [হাশর: ১০]

(اللَّهُمَ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ) অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমাদের কাছে ঈমানকে সবচেয়ে প্রিয় বানিয়ে দাও। তা আমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করো। এবং কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীকে সবচেয়ে ঘৃণ্য বানিয়ে দাও। আমাদেরকে করো সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত’।

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ) অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের শাস্তি, কবরের ফিতনা ও কবরের শাস্তি, ধনাঢ্যতার ফিতনার অনিষ্ট এবং দারিদ্রতার ফিতনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! বরফ, পানি ও শিলাখণ্ড দ্বারা তুমি আমার হৃদয়কে ধুয়ে দাও। আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করো যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আলস্য, পাপ ও ঋণের বোঝা থেকে আশ্রয় চাই’।

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، والْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা ও অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার কাছে কবরের শাস্তি, জীবন ও মৃত্যুর যাবতীয় ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই’।

(اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ) অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদের কষ্ট, দুর্ভোগের আক্রমণ, মন্দ ফয়সালা ও (বিপদে) শত্রুর উপহাস হতে’।

(اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার দীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও যার মধ্যে রয়েছে আমার সমুদয় কার্যাদির আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করে দাও আমার পার্থিব জীবনকে যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবিকা। আর আমার আখিরাতকে তুমি করে দাও বিশুদ্ধ, যেখানে আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমার দীর্ঘ জীবনকে অধিকতর মঙ্গল কাজের উসিলা করে দাও। আর আমার মৃত্যুকে প্রত্যেক অনিষ্ট হতে আমার জন্য শান্তির উসিলা করে দাও'।

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করছি'।

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অপারগতা ও অলসতা থেকে। কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে। চরম বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার আত্মায় তাকওয়া দান করো। আর একে মন্দ কাজ থেকে পবিত্র করো; তুমিই উত্তম পবিত্রকারী আর তুমিই (আত্মার) বন্ধু এবং মালিক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ওই অন্তর থেকে আশ্রয় চাই যে অন্তর ভীত হয় না, আর ওই আত্মা থেকে যা তৃপ্ত হয় না, ওই ইলম থেকে যা উপকারে আসে না। আর ওই দোয়া থেকে যা কবুল করা হয় না'।

(اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত দাও। আমাকে ঠিক করে দাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত ও সংশোধন প্রার্থনা করছি'।

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার প্রতি তোমার নিয়ামতের অবক্ষয়, অনাবিল শান্তির অপসারণ, শাস্তির আকস্মিক আক্রমণ এবং তোমার সব অসন্তোষ হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

(اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالِي، وَوَلَدِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দাও। আমাকে প্রদত্ত সবকিছুতে বরকত দান করো'।

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) অর্থ: 'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই যিনি মহান ও ধৈর্যশীল। তিনি ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনি আসমান ও যমীনের রব এবং মহান আরশের রব'।

(اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমারই এক বান্দার পুত্র এবং তোমার এক বাঁদীর পুত্র। আমার কপাল (নিয়ন্ত্রণ) তোমার হাতে; আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর; আমার ব্যাপারে তোমার ফয়সালা ন্যায়পূর্ণ। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার প্রতিটি

নামের উসীলায়; যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ অথবা তোমার সৃষ্টজীবের কাউকেও শিখিয়েছ অথবা নিজ গায়েবী জ্ঞানে নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রেখেছ—তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার দুঃখের অপসারণকারী এবং দুশ্চিন্তা দূরকারী'।

(اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ) অর্থ: 'হে হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণকর্তা! তুমি আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার আনুগত্যের অভিমুখী করো'।

(يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ) অর্থ: 'হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের ওপর অটল রাখো'।

(اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাময়, মহানুভব। তুমি ক্ষমা পছন্দ করো। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও'।

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নেক কাজ করা, অসৎ কাজ পরিত্যাগ এবং মিসকীনদের ভালবাসার গুণাবলী দাও। আরো প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো। আর যখন তুমি কোন জাতিকে কোন প্রকার ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করো তখন আমাকে ফিতনামুক্ত মৃত্যু দান করো। তোমার ভালবাসা আমি চাই, যারা তোমাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসাও চাই এবং এমন আমলের ভালবাসা আমি চাই, যে আমল আমাকে তোমার ভালবাসার নিকট পৌঁছে দেবে'।

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সব ধরনের কল্যাণ চাই। বর্তমানের কল্যাণ চাই ও ভবিষ্যতের কল্যাণ চাই। যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি জানি তা চাই এবং যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি জানি না সেটাও চাই। তোমার কাছে সব ধরনের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। বর্তমানের অকল্যাণ থেকে ও ভবিষ্যতের অকল্যাণ থেকে। যে অকল্যাণ সম্পর্কে আমি জানি তা থেকে এবং যে অকল্যাণ সম্পর্কে আমি জানি না তা থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করছি যা তোমার বান্দা ও নবী তোমার কাছে প্রার্থনা করেছেন। আমি তোমার কাছে সেসব অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা থেকে তোমার বান্দা ও নবী আশ্রয় চেয়েছেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি। এবং এমন কথা ও কাজের তাওফীক প্রার্থনা করছি- যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে। আর তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক প্রার্থনা করছি- যা আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিবে। আর আমি তোমার কাছে আমার ব্যাপারে সকল কল্যাণকর সিদ্ধান্ত কামনা করি'।

(اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا

(تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরে এমন ভীতির সঞ্চার করে দাও যা আমাদের ও পাপ কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধক হতে পারে। আমাদের এমন আনুগত্য প্রদান করো যা আমাদের বেহেশতে পৌঁছে দেওয়ার উপকরণ হয়। আর আমাদের অন্তরে এমন বিশ্বাস উদয় করে দাও যা আমাদের বাস্তব জীবনের অনিষ্টতা ও ক্ষতির প্রতিষেধক হতে পারে। আর তুমি যত দিন আমাদের জীবিত রাখবে, তত দিন আমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অক্ষত রাখবে। যাতে আমরা লাভবান হতে সমর্থ হই। এ কল্যাণ আমাদের পরেও জারি রেখো। অধিকন্তু যারা আমাদের ওপর অত্যাচার করবে, আমাদের জন্য তুমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। আর আমাদের শত্রুদের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করো। এই পার্থিব জীবনকে আমাদের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করো না এবং সেটাকে জ্ঞানের শেষ পরিণতি করো না। দীনের ব্যাপারে আমাদের বিপদে নিক্ষেপ করো না। আমাদের পাপের কারণে আমাদের ওপর এমন শাসক চাপিয়ে দিও না, যার অন্তরে তোমার ভয়ভীতি নেই এবং যে আমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবে না'।

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ أنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ القَبْرِ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি'।

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي، وَجِدِّي، وَخَطَئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي) অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ মাফ করো, আমার অজ্ঞতা ও আমার কাজে সীমালঙ্ঘন, আর যা তুমি আমার চেয়েও বেশি জানো। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করো যা আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, খামখেয়ালী করা, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় করা আর যা সবগুলোই আমার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়'।

(اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আমার নিজ আত্মার উপর বড়ই অত্যাচার করেছি, গুনাহ মাফকারী একমাত্র তুমিই; অতএব তুমি তোমা হতেই আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু'।

(اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! তোমারই বশ্যতা স্বীকার করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমার উপরই ভরসা করেছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার জন্যই তোমার দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা বিবাদ-লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়েছি। হে আল্লাহ! আমাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে তোমার ইযযতের দোহাই দিয়ে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তুমি এমন এক চিরঞ্জীব সত্ত্বা, যার কোন মৃত্যু নেই; কিন্তু মানব এবং জিন জাতি মরণশীল'।

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ) অর্থ: হে আল্লাহ! আকাশ, যমিন ও মহান আরশের প্রভু, সকল বস্তুর প্রভু, শষ্য দানা বিদীর্ণকারী, তাওরাত, ইনযীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে যার

নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে। তুমিই প্রথম তোমার পূর্বে আর কিছুই নেই, তুমিই শেষ তোমার পরে আর কিছুই নেই, তুমিই প্রকাশ্য তোমার উপরে আর কিছুই নেই, তুমিই গোপন তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্যমুক্ত করো'।

(اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার যিকির, তোমার শোকর ও তোমার সুন্দর ইবাদতের ক্ষেত্রে সহায়তা করো'।

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি চিন্তা ও উদ্বেগ, অক্ষমতা ও অলসতা, কৃপণতা ও কাপুরুষতা, ঋণের গুরুভার ও মানুষের অধীনতা হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجالِ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। কবরের শাস্তি থেকে পানাহ চাই। যে ফেতনাগুলো দেখা যায় আর যেগুলো দেখা যায় না, সব ধরনের ফেতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আর আমি তোমার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সুরক্ষা চাই'।

(اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قْضَيْتَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দিয়ে তাদের দলভুক্ত করো যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত করো, যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ। আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান করে আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, যাদের দায়িত্ব তুমি নিয়েছো। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ, তাতে বরকত দাও। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ, তার মন্দত্ব থেকে রক্ষা কর। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাস, সে লাঞ্ছিত হয় না। তুমি বরকতময় হে আমাদের প্রভু এবং তুমি সুমহান!

(لَا إِله إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، لَهُ الْمُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ) অর্থ: 'এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান'।

মুযদালিফায় রাত্রিযাপন:

আরাফার দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে হাজী সাহেব মুযদালিফার দিকে যাবেন। অত্যন্ত ধীরস্থিরতার সঙ্গে অগ্রসর হবেন। অন্যান্য হাজী সাহেবগণকে কষ্ট দিবেন না। মুযদালিফায় পৌঁছার পরে আসবাবপত্র নামানোর আগেই সালাত আদায় করে নিবেন। মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করবেন। মাগরিব তিন রাকাআত আর ইশা দুই রাকাআত পড়বেন।

অতঃপর সমগ্র রাত মুযদালিফায় কাটাবেন। দুর্বল পুরুষ ও নারীরা চাইলে মধ্যরাত[১] অতিবাহিত হবার পরেই মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে যাত্রা করতে পারেন। যেমনটা ইতঃপূর্বে 'হজ্জের ওয়াজিবসমূহ' সম্পর্কিত আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

কিন্তু যারা দুর্বল নন কিংবা দুর্বলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন তাদের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো ফজর পর্যন্ত মুযদালিফাতে অবস্থান করা। সেখানেই ফজর পড়া। চতুর্দিক আলোকিত হবার আগ পর্যন্ত মুযদালিফা পরিত্যাগ না করা। এটাই রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত।

---

(১) 'মধ্যরাত' বলতে সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়ের মাঝামাঝি সময়কে বোঝায়। রাতের দীর্ঘতা ও ক্ষুদ্রতা হিসেবে এই সময়ে ভিন্নতা তৈরি হয়। সবসময় রাত বারোটাকে মধ্যরাত মনে করা সঠিক নয়।

ফজরের সালাত আদায়ের পরে সম্ভব হলে 'মাশআরে হারামে' আসবেন। সেখানে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা দিবেন। তাকবীর ও তাহলীল পড়বেন। অতঃপর যা খুশি দুআ করবেন। চতুর্দিক আলোকিত হওয়া পর্যন্ত দুআ ও যিকিরে মগ্ন থাকবেন। অতঃপর সূর্য ওঠার আগেই মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে যাত্রা করবেন।

আর যদি 'মাশআরে হারামে' যাওয়া সম্ভব না হয় তবে মুযদালিফায় নিজ স্থান থেকেই কিবলামুখী হবেন। অতঃপর তাকবীর, তাহলীল, দুআ ও মুনাজাতে মগ্ন হবেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমি এখানে কুরবানী করেছি। মিনার সর্বত্রই কুরবানী করা যায়। তোমরা তোমাদের তাবুঁতে কুরবানী করো। আমি এখানে অবস্থান করেছি। আরাফার সর্বত্রই অবস্থান করা যায়। আমি এখানে অবস্থান করেছি। মুযদালিফার সর্বত্রই অবস্থান করা যায়'(১)।

উপরিউক্ত সবগুলো বিষয় রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাজ দ্বারা প্রমাণিত। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এর দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, 'সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি (আরাফাতে) অবস্থান করেন। সূর্যের হলুদাভা মিশে গিয়ে একসময় সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলো। তিনি উসামাকে নিজের পেছনে বসিয়ে চলা শুরু করলেন। তিনি কাসওয়ার লাগাম টান দিলে সেটার মাথা পাদান স্পর্শ করলো। তিনি তাঁর ডান হাতের ইশারায় বলছিলেন, 'লোকসকল! ধীরে ধীরে চলো'। যখনই বালুর স্তূপ সামনে পড়তো তিনি লাগাম শিথিল করে দিতেন যাতে উষ্ট্রী সেখানে উঠতে পারে। এভাবে এক সময় তিনি মুযদালিফায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে এক আজান ও দুই ইকামাতের সঙ্গে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন। মাঝে কোনো নফল আদায় করেননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজর পর্যন্ত শুইলেন। সুবহে সাদিক হলে তিনি এক আজান ও এক ইকামতের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেন। অতঃপর তাঁর কাসওয়া উষ্ট্রীতে চড়ে মাশআরে হারামে পৌঁছেন। সেখানে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেন। তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করেন। আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেন। এভাবে তিনি চতুর্দিক আলোকিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। সূর্য ওঠার আগে আগে তিনি রওয়ানা হন(২)।

মুযদালিফা থেকে মিনায় গমন ও তথায় অবস্থান:

যুলহজ্জের দশ তারিখ পবিত্র ঈদুল আযহা তথা কুরবানীর দিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই হাজীগণ মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন। মিনা পৌঁছে চারটি কাজ করবেন:

১- জামরায়ে আকাবা তথা সর্ববৃহৎ ও সর্বশেষ জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করবেন:

চানাবুটের মতো ছোট ছোট সাতটি কংকর সংগ্রহ করবেন। এগুলো যে কোনো স্থান থেকে সংগ্রহ করা যায়। বিশেষ নির্ধারিত কোনো স্থান নেই। অতঃপর সেগুলো একটি একটি করে জামরাতে নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। সবগুলো একসঙ্গে মারবেন না।

সম্ভব হলে 'বাতনে ওয়াদী' থেকে কংকর নিক্ষেপ করবেন। এতে কা'বা থাকবে বামে আর মিনা থাকবে ডানে। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'তিনি জামরায়ে কুবরাতে এসে বাইতুল্লাহ বামে আর মিনা ডানে রাখলেন। অতঃপর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বললেন, 'তিনি এভাবে কংকর নিক্ষেপ করেছেন যার ওপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে' [অর্থাৎ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] (৩)।

পাথর জাতীয় বস্তু ছাড়া অন্য কিছু যথা জুতো, মোজা এগুলো নিক্ষেপ করা বৈধ নয়।

নিক্ষিপ্ত কংকর জামরার যথাস্থানে পতিত হলেই যথেষ্ট। সেখানে গিয়ে থাকতে হবে এমন জরুরি নয়।

২- তামাত্তু' ও ক্বিরান হজ্জ আদায়কারী সম্ভব হলে নিজের হাতে জবাই করবেন। সেটা সম্ভব না হলে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিবেন। এতে কোনো সমস্যা নেই।

পেছনে কুরবানীর পশু, জবাইয়ের সময় সংক্রান্ত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

---

(১) মুসলিম (১২১৮; ১৪৯)

(২) মুসলিম (১২১৮)

(৩) বুখারী (১৭৪৮)। মুসলিম (১২৯৬)

৩- মাথা মুণ্ডন করবেন কিংবা চুল ছোট করবেন। পুরুষের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা। তবে চুল কেটে ছোট করাও বৈধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾ অর্থ: 'আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে। মুণ্ডিত মস্তক এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়'। [ফাতাহ: ২৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে মাথা মুণ্ডন করেছেন; ছোট করেননি। আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনায় আসেন। অতঃপর জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর মিনায় নিজ অবস্থানস্থলে এসে কুরবানী করেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডনের জন্য তৈরী সাহাবীকে বলেন, 'এখান থেকে শুরু করো'। এটা বলে তিনি ডান দিকে ইশারা করেন। অতঃপর বাম দিক কাটতে বলেন'[১]। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিন বার আর ছোটকারীদের জন্য মাত্র একবার দুআ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুআ করেন, 'আল্লাহ তাআলা মুণ্ডনকারীদেরকে রহম করুন'। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! চুল ছোটকারীগণ? তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা মুণ্ডনকারীদেরকে রহম করুন'। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর চুল ছোটকারীগণ? তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা মুণ্ডনকারীদেরকে রহম করুন'। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর চুল ছোটকারীগণ? তিনি বললেন, 'চুল ছোটকারীদেরকেও রহম করুন'[২]।

মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছোট করা সমগ্র মাথার জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং যেটাই করা হোক পুরো মাথা জুড়ে করতে হবে।

আর নারীগণ চুলের প্রান্তদেশ থেকে কেবল এক কড় পরিমাণ কেটে ফেলবেন।

হাজী সাহেব জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ এবং মাথা কামানো কিংবা চুল ছোট করার মধ্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। কেবল স্ত্রীমিলন ছাড়া ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সব কাজ তার জন্য তখন বৈধ হয়ে যাবে। ফলে তিনি পায়জামা, গেঞ্জি, জামা যা ইচ্ছা পরতে পারবেন। সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবেন। চুল ও নখ কাটতে পারবেন। কেবল যৌন মিলন বৈধ হবে না। এটাকে প্রাথমিক হালাল বলা হয়। এই স্তরের হালাল হবার পরে সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করতেন আমি তাকে সুগন্ধি মেখে দিতাম। আবার তিনি যখন বাইতুল্লাহ তওয়াফের আগে হালাল হতেন আমি তাকে সুগন্ধি মেখে দিতাম'[৩]। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি দিয়ে দিতাম। আবার কুরবানীর দিন বাইতুল্লাহ তওয়াফের আগে মেশকসমৃদ্ধ সুগন্ধি মেখে দিতাম'[৪]।

৪- আল্লাহর ঘর তওয়াফ করবেন। এটা 'তওয়াফে ইফাজা', 'তওয়াফে যিয়ারাহ', 'হজ্জের তওয়াফ'সহ বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ অর্থ: 'এরপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে ও তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের'। [হজ্জ: ২৯] রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জ সম্পর্কে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এর হাদীসে এসেছে তিনি বলেন, 'অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওয়ারীতে চড়েন এবং বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন। এরপর মক্কাতে যোহরের সালাত আদায় করেন'[৫]। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে হজ্জ করেছি।

---

(১) মুসলিম (১৩০৫)

(২) বুখারী (১৭২৭)। মুসলিম (১৩০১)

(৩) বুখারী (১৫৩৯)। মুসলিম (১১৮৯; ৩৩)

(৪) মুসলিম (১১৯১; ৪৬)

(৫) মুসলিম (১২১৮)

কুরবানীর দিন আমরা তওয়াফে ইফাজা সম্পন্ন করেছি'[১]। নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জের বর্ণনা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর হাদীসে এসেছে, 'তিনি কুরবানীর দিন কুরবানী করেন। অতঃপর বাইতুল্লাহ তওয়াফ করেন। অতঃপর পুরোপুরি হালাল হয়ে যান'[২]।

হাজী সাহেব যদি তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারী হন তবে তওয়াফে ইফাজার পরে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা আবশ্যক। কারণ তার প্রথমে কৃত সাঈটি ছিল উমরার জন্য। এখন তাকে হজ্জের জন্য আবার সাঈ করতে হবে। কারণ হজ্জ ও উমরা দু'টো স্বতন্ত্র ইবাদত। আর হজ্জ কিংবা উমরার একটাও সাঈ ব্যতীত পূর্ণ হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ﴾ অর্থ: 'নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ (সাঈ) করাতে দোষ নেই'। [বাকারা: ১৫৮] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে হজ্জে তামাত্তু' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'বিদায় হজ্জের সময় মুহাজিরগণ, আনসারগণ, নবীজীর স্ত্রীগণ ইহরাম বাঁধেন। আমরাও ইহরাম বাঁধি। মক্কায় পৌঁছার পরে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'তোমাদের হজ্জের ইহরামকে তোমরা উমরার ইহরাম বানিয়ে নাও। তবে যার সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) রয়েছে সে ব্যতীত'। অতঃপর আমরা বাইতুল্লাহ তওয়াফ করি। সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করি। (এভাবে হালাল হয়ে) স্ত্রীদের কাছে গমন করি, (সেলাইকৃত স্বাভাবিক) পোশাক পরিধান করি'। তিনি 'যার সঙ্গে কুরবানীর পশু রয়েছে' এমন কথা বলেছেন কারণ সে ব্যক্তি কুরবানীর পশু যথাস্থানে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হালাল হবে না। অতঃপর তিনি আমাদেরকে তারউইয়াহর দিন (অষ্টম তারিখ) হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন। আরও বলেন, আমরা যেন সকল আমল সম্পন্ন করে বাইতুল্লাহতে আসি। আল্লাহর ঘর তওয়াফ করি। সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করি। এতে আমাদের হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। আমাদের জন্য পশু জবাই করা আবশ্যক হবে'[৩]। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল তারা বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন। অতঃপর হালাল হয়ে যান। অতঃপর মিনা থেকে ফিরে এসে হজ্জের জন্য আবার তওয়াফ করেন। আর যারা হজ্জ ও উমরা দু'টো একত্রে করেছেন তারা কেবল একবার তওয়াফ করেন'[৪]।

আর যদি হাজী সাহেব 'ইফরাদ' কিংবা 'ক্বিরান' হজ্জ আদায়কারী হন, তিনি যদি তওয়াফে কুদূম তথা আগমনী তওয়াফের পরে সাঈ করে থাকেন, তবে দ্বিতীয়বার সাঈ করতে হবে না। কারণ তিনি সাঈ আগেই করে ফেলেছেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবাগণ একবারই সাফা-মারওয়ার মাঝে তওয়াফ (সাঈ) করেছেন'। কোনো কোনো বর্ণনায়, 'কেবল প্রথম বারের তওয়াফ (সাঈ) কথাটি উল্লেখ রয়েছে'[৫]। আয়েশা (রা.) এর উপরিউক্ত হাদীসও এর প্রমাণ যেখানে তিনি বলেছেন, 'তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারীগণ কেবল একবারই সাঈ করবেন।

আর যদি পূর্বে সাঈ না করে থাকেন তবে সাঈ করা আবশ্যক হবে। কারণ সাঈ ব্যতীত হজ্জ পূর্ণতা লাভ করবে না।

হাজী সাহেব তওয়াফে ইফাজা ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর মধ্য দিয়ে পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবেন। তখন তার ওপর ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ যাবতীয় সবকিছু বৈধ হয়ে যাবে। নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জের বর্ণনা প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, 'অতঃপর তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হননি যে যাবত না হজ্জ সম্পূর্ণ করেন, কুরবানীর দিন তাঁর পশু জবাই করেন। অতঃপর বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন। এভাবে তিনি সবধরনের নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যান'[৬]।

---

(১) বুখারী (১৭৩৩)
(২) বুখারী (১৬৯১)। মুসলিম (১২২৭)
(৩) বুখারী (১৫৭২)
(৪) বুখারী (১৫৫৬)। মুসলিম (১২১১)
(৫) মুসলিম (১২১৫)
(৬) বুখারী (১৬৯১)। মুসলিম (১২২৭)

উপরিউক্ত সবগুলো বিষয় রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এর দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুআ অব্যাহত রাখেন এক পর্যায়ে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে যায়। তখন তিনি সূর্য ওঠার আগেই (মিনার দিকে) যাত্রা শুরু করেন। বাতনে মুহাসসির এলাকায় এলে তিনি সওয়ারীকে কিছুটা দ্রুত চালিত করেন। অতঃপর তিনি মধ্যপথ গ্রহণ করেন যা জামরায়ে কুবরাতে গিয়ে পৌঁছেছে। বৃক্ষের নিকটবর্তী জামরায় এসে তিনি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর দেন। তিনি বাতনে ওয়াদীতে দাঁড়িয়ে কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর পশু কুরবানীর স্থলে যান এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু জবাই করেন। অতঃপর আলী (রা.) বাকিগুলো জবাই করেন। তাঁকেও কুরবানীর পশুতে অংশীদার বানান। অতঃপর প্রত্যেকটি পশু থেকে সামান্য করে মাংস একটি পাত্রে একত্র করে রান্নার নির্দেশ দেন। রান্না হলে তিনি ও আলী সেই মাংস খান এবং ঝোল পান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওয়ারীর পিঠে চড়ে বাইতুল্লাহতে আসেন। মক্কাতে যোহরের সালাত আদায় করেন'(১)।

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পরে করণীয় চারটি আমল যা ধারাবাহিকভাবে পালন করা সুন্নাত- ওপরের হাদীসে চলে এসেছে। সেগুলো হলো:

১- জামরায়ে আকাবাতের কংকর নিক্ষেপ।

২- তামাত্তু' ও ক্বিরান হজ্জ আদায়কারীর জন্য কুরবানী।

৩- মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছোট করা।

৪- তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারীর ক্ষেত্রে তওয়াফের পরে সাঈ করা। 'ক্বিরান' ও 'ইফরাদ' হজ্জ আদায়কারী কেবল তওয়াফ করবেন; সাঈ করবেন না। হ্যাঁ তওয়াফে কুদূমের সঙ্গে সাঈ না করে থাকলে এখন করবেন। কিন্তু তখন এসেই সাঈ করে থাকলে সেটা শেষ হয়ে গেছে। পুনরায় করতে হবে না।

এসব আমল ধারাবাহিকভাবে পালন করা উত্তম। তবে যদি কোনোটা আগ-পিছ করে তাতে ক্ষতি নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের সময় মিনার ময়দানে ছিলেন। মানুষ তাকে প্রশ্ন করছিল। এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি জবাই করার আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। বুঝতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'এখন জবাই করো। কোনো সমস্যা নেই'। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, 'আমি না বুঝে জামরাতে কংকর মারার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, 'এখন কংকর মারো সমস্যা নেই'। এই দিনের কোনো কাজ আগে করা কিংবা কোনো কাজ পরে করার ব্যাপারে যা কিছু তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি কেবল এটুকু বললেন, 'করো। সমস্যা নেই'(২)।

অপর বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরবানীর দিন জামরাতে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কংকর নিক্ষেপের আগেই মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন, 'এখন নিক্ষেপ করো। অসুবিধা নেই'। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আমি কংকর নিক্ষেপের আগে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বলেন, 'এখন নিক্ষেপ করো। সমস্যা নেই'। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আমি কংকর নিক্ষেপের আগেই বাইতুল্লাহতে গিয়ে তওয়াফ করে ফেলেছি। তিনি বললেন, 'এখন নিক্ষেপ করো সমস্যা নেই'। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেদিন দেখেছি তাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তিনি সবকিছুতে বলেছেন, 'করো। সমস্যা নেই'(৩)।

মিনায় রাতযাপনের জন্য প্রত্যাবর্তন ও জামরাতে কংকর নিক্ষেপ:

ঈদের দিন তওয়াফ ও সাঈ শেষ করে হাজী সাহেব মিনায় ফিরে যাবেন। সেখানে ঈদের দিন ও ঈদ পরবর্তী আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে অবস্থান করবেন। হাজীদের জন্য মিনার ময়দানে এগারো ও বারো তারিখের রাত যাপন করা ওয়াজিব। আর যদি কেউ আরও থাকতে চান তবে তেরো তারিখের রাত যাপন করাও

(১) মুসলিম (১২১৮)

(২) বুখারী (৮৩)। মুসলিম (১৩০৬)

(৩) মুসলিম (১৩০৬; ৩৩৩)

ওয়াজিব। বরং তেরো তারিখ পর্যন্ত থাকাই উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ অর্থ: 'আর স্মরণ করো আল্লাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে যাবে শুধু দুই দিনের মধ্যে তার জন্য কোন পাপ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তাঁর উপর কোন পাপ নেই। এটা তাদের জন্য যারা ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো'। [বাকারা: ২০৩] আব্দুর রহমান ইবনে ইয়া'মার দীলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি আরাফার ময়দানে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে দেখা করলাম। তখন নজদ থেকে কিছু লোক এলো। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, হজ্জ কীভাবে করতে হবে? তখন তাঁর নির্দেশে এক ব্যক্তি (সাহাবী) জবাবে বললেন, 'হজ্জ হলো আরাফার দিন। সুতরাং যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতের সূর্যোদয়ের সামান্য সময় পূর্বেও আরাফায় আসবে তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। আর মিনা তিন দিন। যে ব্যক্তি দু'দিন পরে চলে যাবে তার কোনো গুনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি (তিন দিন পর্যন্ত) বিলম্ব করবে তারও গুনাহ নেই'। বর্ণনাকারী বলেন, 'অতঃপর তিনি তাঁর পেছনে এক লোককে বসালেন। তিনি সেই ঘোষণা দিতে লাগলেন'(১)। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় যোহরের সালাত আদায় করে দিনের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে তওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে ফিরে আসেন। সেখানে তাশরীকের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। প্রত্যেক দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পরে তিনি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রত্যেক জামরাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় জামরাতে কংকর নিক্ষেপের পর দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন এবং কান্নাকাটি ও দুআ করেন। অতঃপর তৃতীয় জামরাতে (জামরায়ে আকাবা) কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন করে সেখান থেকে দ্রুত চলে যান'(২)।

হজ্জ কিংবা হাজ্জীদের কোনো কল্যাণকর স্বার্থে মিনার বাইরে রাত কাটানো বৈধ। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) হাজীদেরকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনার রাতগুলো মক্কায় কাটানোর জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে অনুমতি দেন(৩)।

আসেম ইবনে আদী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটের রাখালদেরকে মিনায় রাত (না) কাটানোর ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। তারা কুরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আগামী দিন কিংবা আগামী দিনের পরের দুই দিন এবং ফেরার দিন কংকর নিক্ষেপ করবে'(৪)।

তাশরীকের তিন দিনের প্রতিদিন তিন জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক জামরাতে একটির পর একটি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর দিবেন। কংকরগুলো সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে নিক্ষেপ করবেন।

প্রথমে মসজিদুল খাইফের সন্নিকটে অবস্থিত জামরায়ে ঊলা তথা প্রথম জামরাতে নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে কিবলার দিকে ফিরে দাঁড়াবেন। হাত তুলে দীর্ঘ সময় দুআ ও মুনাজাতে ডুবে থাকবেন।

অতঃপর মধ্যবর্তী (দ্বিতীয়) জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করবেন। শেষ হলে রাস্তার বাম দিক দিয়ে একটু সামনে অগ্রসর হবেন। সেখানে কিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে দীর্ঘ সময় দুআ করবেন।

অতঃপর জামরায়ে আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করবেন। এবার নিক্ষেপের পরে না দাঁড়িয়ে দ্রুত চলে যাবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তনয় সালেম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) প্রথম জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং তাঁর উভয় হাত তুলে দু'আ করতেন। তারপর মধ্যবর্তী জামরায় কংকর মারতেন এবং একটু বাঁ দিকে চলে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে

---

(১) আবু দাউদ (১৯৪৯)। তিরমিযী (৮৮৯)। নাসায়ী (৩০১৬)। ইবনে মাজাহ (৩০১৫)

(২) আবু দাউদ (১৯৭৩)। এটার সনদে দুর্বলতা রয়েছে। তবে অন্যান্য কাছাকাছি বর্ণনা (শাওয়াহিদ) দ্বারা শক্তিশালী হয়।

(৩) বুখারী (১৬৩৪)। মুসলিম (১৩১৫)

(৪) আবু দাউদ (১৯৭৫)। তিরমিযী (৯৫৫)। নাসায়ী (৩০৬৯)। ইবনে মাজাহ (৩০৩৭)। মুসনাদে আহমদ (২৩৭৭৫)

উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর বাতন ওয়াদী থেকে জামরায়ে আকাবায় কংকর মারতেন। কিন্তু এখানে দাঁড়াতেন না। তিনি বলতেন, 'আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এরূপ করতে দেখেছি'(১)।

তাশরীকের দিনগুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পরে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরবানীর দিন সকালে জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে (নিক্ষেপ করেছেন)' (২)। ওয়াবারা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম- জামরাতে কখন কংকর নিক্ষেপ করবো? তিনি বললেন, 'যখন তোমার দলনেতা নিক্ষেপ করেন তখন নিক্ষেপ করো'। আমি তাকে আবারও জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'আমরা সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম। এরপর যখন সূর্য ঢলে পড়তো তখন আমরা কংকর নিক্ষেপ করতাম'(৩)।

বারো তারিখের কংকর নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে হাজী সাহেব হজ্জের ওয়াজিবগুলো থেকে ফারেগ হয়ে যাবেন। ফলে চাইলে তিনি সেদিনই মিনা পরিত্যাগ করতে পারেন। অথবা চাইলে তেরো তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করে তেরো তারিখ সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে কংকর মারতে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ অর্থ: 'আর স্মরণ করো আল্লাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে যাবে শুধু দুই দিনের মধ্যে তার জন্য কোন পাপ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তাঁর উপর কোন পাপ নেই। এটা তাদের জন্য যারা ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো'। [বাকারা: ২০৩] তবে (তেরো তারিখ পর্যন্ত) বিলম্ব করা উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন। উপরন্তু একদিন বেশি থাকলে মিনায় রাত যাপন, কংকর নিক্ষেপসহ বিভিন্ন ইবাদত এবং দুআ ও মুনাজাতের মধ্য দিয়ে পুণ্যও বেশি হয় নিঃসন্দেহে।

তবে কেউ একদিন আগে চলে যেতে চাইলে সেটাও বৈধ। এক্ষেত্রে বারো তারিখ সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই তাকে মিনা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। যদি মিনায় থাকা অবস্থায় বারো তারিখের সূর্য অস্তমিত হয়ে পড়ে তবে তিনি সেদিন আর বের হবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই দিনের মাঝে দ্রুত ফিরে যাবে তার কোনো গুনাহ নেই'। এখানে তিনি দ্রুত ফিরে যাওয়াকে দুই দিনের মাঝে সীমাবদ্ধ করেছেন। আর সূর্য অস্ত যাওয়ার মাধ্যমে দিন খতম হয়ে যায়। ফলে বারো তারিখের সূর্য অস্ত যাওয়ার মাধ্যমে দ্রুত ফিরে যাওয়ার সময় শেষ হয়ে যাবে এবং তাকে পরবর্তী দিন পর্যন্ত থাকতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'তাশরীকের দিনগুলোতে মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্যাস্তের পরে কেউ যেন ফিরে না আসে। বরং পরের দিন কংকর নিক্ষেপের পরে ফিরবে'(৪)।

কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ:

পুরুষ কিংবা নারী প্রত্যেক হাজী সাহেবদের ওপর নিজের কংকর মারা ওয়াজিব। ফলে অন্য কাউকে এক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা বৈধ নয়। হ্যাঁ অত্যন্ত বার্ধক্য, অসুস্থতা, দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে কেউ যদি নিজে কংকর মারার সক্ষমতা না রাখেন তবে তিনি অপারগ হিসেবে অন্যকে প্রতিনিধি বানাতে পারবেন।

সুতরাং কেউ যদি নিজে কংকর নিক্ষেপ করতে না পারেন তিনি নির্ভরযোগ্য কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। সেই প্রতিনিধি প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে অতঃপর নিয়োগকারীর পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করবেন।

প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে কংকর নিক্ষেপের পদ্ধতি হলো: প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে তিনি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর তাকে যিনি দায়িত্ব দিয়েছেন তার পক্ষ থেকে সাতটি নিক্ষেপ করবেন।

---

(১) বুখারী (১৭৫২)

(২) মুসলিম (১২৯৯)

(৩) বুখারী (১৭৪৬)

(৪) মুয়াত্তা মালেক (২১৪)

এ ক্ষেত্রে একই জামরাতে প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে অতঃপর নিয়োগদাতার পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ বৈধ। প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে তিন জামরাতে নিক্ষেপ করতে হবে অতঃপর আবার ফিরে এসে নিয়োদগাতার পক্ষ থেকে তিন জামরাতে নিক্ষেপ করতে হবে- এমনটা জরুরি নয়।

বিদায়ী তওয়াফ:

হজ্জের সকল কাজ সম্পন্ন করার পরে হাজী সাহেব যখন মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবার প্রস্তুত নিবেন তখন তাকে বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। এটা করা ব্যতীত মক্কা ত্যাগ করা বৈধ হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক সময় মানুষ ইচ্ছামতো (হজ্জ থেকে) ফিরে আসতো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক হাজীর সর্বশেষ সময় যেন বাইতুল্লাহতে কাটে (তথা তওয়াফ করে)[১]।

বিদায়ী তওয়াফ শেষ করার পরে মক্কাতে অবস্থান করা বৈধ নয়। ফলে সফর কিংবা সফর সংশ্লিষ্ট প্রয়োজন যথা সঙ্গী-সাথী ও গাড়ির অপেক্ষা ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোনো কাজে মক্কাতে ব্যস্ত হয়ে পড়া বৈধ হবে না। যদি উপর্যুক্ত প্রয়োজনগুলো ছাড়া অন্য কোনো কারণে কিংবা শুধু শুধু কেউ মক্কাতে অবস্থান করেন তবে তাকে পুনরায় তওয়াফ করতে হবে। যাতে মক্কাতে থাকা অবস্থায় সর্বশেষ সম্পর্ক থাকে বাইতুল্লাহর সঙ্গে।

আর নারীদের মাঝে যারা হায়েজ কিংবা নেফাসগ্রস্ত থাকবেন তাদের ওপর থেকে বিদায়ী তওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। তারা তওয়াফ করবেন না। এতে কোনো অসুবিধা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তাদের সর্বশেষ মুহূর্তগুলো বাইতুল্লাহতে কাটে। তবে হায়েজগ্রস্ত নারীদের ক্ষেত্রে এই বিধানে ছাড় দেয়া হয়েছে'[২]।

---

(১) মুসলিম (১৩২৭)

(২) বুখারী (১৭৫৫)। মুসলিম (১৩২৮)

এক নজরে হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রম

প্রথম দিন তথা অষ্টম তারিখের কার্যাবলী:

১- নিজস্ব স্থান থেকে ইহরাম বাঁধার প্রস্তুতি নিবেন। এজন্য গোসল করবেন। সুগন্ধি লাগাবেন। ইহরামের পোশাক পরবেন। অতঃপর (মূল ইহরাম শুরুর জন্য) বলবেন, 'লাব্বাইকা হাজ্জান। লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শরীকা লাক'।

২- মিনায় গমন করে সেখানে নবম তারিখ সকালে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করবেন। ফলে অষ্টম তারিখের যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও নবম তারিখের ফজর এই সবগুলো সালাত নিজস্ব ওয়াক্তে আদায় করবেন। চার রাকাআত সালাতগুলো দুই রাকাআত আদায় করবেন।

দ্বিতীয় দিন তথা নবম তারিখের কার্যাবলী:

১- সূর্যোদয়ের পরে আরাফার দিকে রওয়ানা হবেন। সেখানে গিয়ে যোহর ও আসর একত্রে 'কসর' আদায় করবেন। যদি সম্ভব হয় সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে নামিরাতে (আরাফাপূর্ব একটি স্থান) অবস্থান করবেন।

২- সালাত আদায়ের পরে কিবলামুখী হয়ে যিকিরে নিমগ্ন হবেন। দুই হাত তুলে দুআ করবেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদত অব্যাহত রাখবেন।

৩- সূর্যাস্তের পরে মুযদালিফার দিকে যাত্রা শুরু করবেন। মুযদালিফাতে পৌঁছে মাগরিব তিন রাকাআত ও ইশা দুই রাকাআত আদায় করবেন। অতঃপর ফজর পর্যন্ত সেখানে রাত যাপন করবেন।

তৃতীয় তথা ঈদের দিনের কার্যাবলী:

১- ফজরের সময় হয়ে গেলে ফজরের সালাত আদায় করবেন। অতঃপর চতুর্দিক ফর্সা হওয়া পর্যন্ত যিকির ও দুআতে নিমগ্ন থাকবেন।

২- সূর্য ওঠার আগেই মিনার দিকে যাত্রা শুরু করবেন।

৩- মিনায় পৌঁছে জামরায়ে আকাবাতে যাবেন। সেখানে ধারাবাহিকভাবে এক এক করে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবেন।

৪- যদি সঙ্গে কুরবানীর পশু থাকে তবে সেটা কুরবানী করবেন।

৫- মাথা মুণ্ডাবেন কিংবা চুল ছোট করবেন। এভাবে প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। তখন সাধারণ পোশাক, সুগন্ধি ব্যবহারসহ সবকিছু বৈধ হবে। কেবল স্ত্রীমিলন বৈধ হবে না।

৬- অতঃপর মক্কাতে যাবেন। বাইতুল্লাহর চারপাশে সাত প্রদক্ষিণের মাধ্যমে তওয়াফে ইফাজা বা তওয়াফে হজ্জ সম্পন্ন করবেন। অতঃপর হাজী সাহেব যদি তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারী হন তবে আগে (উমরার) সাঈ করে থাকলেও সাফা ও মারওয়ার মাঝে দ্বিতীয়বার (হজ্জের) সাঈ করবেন। আর যদি তামাত্তু' আদায়কারী না হন, তবে আগে সাঈ না করে থাকলে এখন সাঈ করবেন। (আগে করে থাকলে এখন করবেন না)

এটুকু করার মধ্য দিয়ে হাজী সাহেব সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যাবেন। তখন তার জন্য যৌনমিলনসহ স্বাভাবিক জীবনের সবকিছু বৈধ হয়ে যাবে।

৭- মিনায় ফিরে যাবেন। সেখানে এগারো তারিখের রাত যাপন করবেন।

চতুর্থ দিন তথা এগারো তারিখের কার্যাবলী:

১- তিন জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রথম, মধ্যবর্তী ও জামরায়ে আকাবা তথা সর্ববৃহৎ জামরা সবগুলোতে কংকর মারবেন। একটি একটি করে সাতটি কংকর ছুঁড়বেন এবং প্রত্যেক কংকর মারার সময় তাকবীর বলবেন। জামরাতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে কংকর মারবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জামরাতে কংকর নিক্ষেপের পরে দাঁড়িয়ে দুআ করবেন।

২- বারো তারিখের রাত মিনায় কাটাবেন।

পঞ্চম দিন তথা বারো তারিখের কার্যাবলী:

১- বিগত দিনের মতো জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করবেন।

২- যদি দ্রুত চলে যেতে চান তবে সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই মিনা ত্যাগ করবেন। আর সেটা না হলে সে রাত মিনায় কাটাবেন।

ষষ্ঠ দিন তথা তেরো তারিখের কার্যাবলী:

যারা সেদিন পর্যন্ত মিনায় থেকে যাবেন তাদেরকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে:

১- পূর্বোক্ত দুই দিনের মতো তিন জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করবেন।

২- অতঃপর মিনা ত্যাগ করবেন।

সবশেষে মক্কা ত্যাগের পূর্বে আল্লাহর ঘরের বিদায়ী তওয়াফ করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

দ্বাদশ অধ্যায়: মসজিদে নববী যিয়ারত

মসজিদে নববী যিয়ারত করা সুন্নাত। ইসলামে যে তিনটি মসজিদের জন্য দূর থেকে সফর করা বৈধ তন্মধ্যে এটি একটি। ইসলামী শরীয়ত মসজিদে নববী যিয়ারত ও এতে সালাত আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। এমন কয়েকটি বর্ণনা হলো:

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোথাও সফর করা যাবে না। সেগুলো হলো: আমার এই মসজিদ। মসজিদুল হারাম। মসজিদুল আকসা'(১)।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমার এই মসজিদে এক সালাত মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য সকল মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম'(২)।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার ঘর ও মিম্বরের মাঝের অংশটুকু জান্নাতের একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউজের ওপর প্রতিষ্ঠিত'(৩)।

সুতরাং হাজী ও উমরাকারীদের জন্য হজ্জের আগে বা পরে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদ যিয়ারত ও সেখানে সালাত আদায় করা সুন্নাত। তবে এর কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। এই যিয়ারত হজ্জের শর্ত, রোকন কিংবা ওয়াজিব কোনোটিই নয়। বরং হজ্জের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে কেউ যদি হজ্জ করে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদ যিয়ারত করা ব্যতীতই নিজ এলাকায় ফিরে যায় তার হজ্জ বিশুদ্ধ হবে এবং এতে কোনো পাপ হবে না।

এখানে যে বিষয়টি মনে রাখা আবশ্যক সেটা হলো, মদীনা মুনাওয়ারা সফরের মূল লক্ষ্য থাকবে মসজিদে নববী যিয়ারত। নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর, সাহাবাদের কবর কিংবা মসজিদে কুবা বা কোনো স্থান যিয়ারত উদ্দেশ্য থাকবে না। কারণ মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা- এই তিনটি স্থান ব্যতীত আর কোথাও ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ নয়। যেমনটা পেছনে আবু হুরাইরা (রা.) এর হাদীসে এসেছে।

যিয়ারতকারী মসজিদে নববীতে পৌঁছার পরে প্রথমে তাই করবেন যা সকল মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে সুন্নাত: ফলে তিনি ডান পা আগে রেখে ঢুকবেন। ঢোকার সময় বলবেন: 'বিসমিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। আল্লাহুম্মাফ-তাহলী আবওয়া রাহমাতিক'।

এই দুআ ছাড়া মসজিদে নববীতে প্রবেশের ভিন্ন কোনো দুআ নেই।

আবু হুমাইদ অথবা আবু উসাইদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশের সময় যেন বলে, 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক'। আর বের হবার সময় যেন বলে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাজলিক'(৪)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে প্রবেশের সময় এই দুআ পড়তেন: 'আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। আল্লাহুম্মাফ-তাহলী আবওয়া রাহমাতিক'(৫)।

কা'ব আল-আহবার (র.) থেকে বর্ণিত তিনি আবু হুরাইরা (রা.) কে বলেন, 'আমি আপনাকে দু'টো দুআ শিখিয়ে দিচ্ছি এগুলো কখনো ভুলবেন না। যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর দরূদ পাঠ করে বলবেন: 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক'। আর যখন

---

(১) বুখারী (১১৮৯)। মুসলিম (১৩৯৭)

(২) বুখারী (১১৯০)। মুসলিম (১৩৯৪)

(৩) বুখারী (১১৯৬)। মুসলিম (১৩৯১)

(৪) মুসলিম (৭১৩)

(৫) আবু দাউদ (৪৬৬)

বের হবেন তখন নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর দরূদ পাঠ করে বলবেন: 'আল্লাহুম্মাহফাজনী মিনাশ শাইতান'[১]।

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর সালাম পাঠ করতেন অতঃপর বলতেন, 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক'। আর যখন বের হতেন নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর সালাম পাঠ করতেন অতঃপর শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন[২]।

অতঃপর তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকাআত সালাত আদায় করবেন। আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, বসার পূর্বেই যেন দুই রাকাআত সালাত পড়ে নেয়'[৩]। এই দুই রাকাআত সালাত রওজা (তথা রিয়াজুল জান্নাতে) পড়তে পারলে সবচেয়ে উত্তম। যেমনটা আবু হুরাইরা (রা.) এর হাদীসে এসেছে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমার ঘর আর মিম্বরের মাঝের অংশটুকু জান্নাতের একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউজের ওপর প্রতিষ্ঠিত'[৪]। যদি রওজাতে পড়া সম্ভব না হয় তবে মসজিদের যে কোনো জায়গাতে পড়ে নিলেই হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের কবর যিয়ারত

মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায়ের পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমার) ওপর সালাম দেয়ার জন্য গমন করা বৈধ।

১- সুতরাং নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের সামনে কবর অভিমুখী হয়ে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে দাঁড়াবেন। অতঃপর বিনত কণ্ঠে বলবেন, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ'। চাইলে আরেকটু বাড়িয়ে এভাবে সালাম দেয়া যেতে পারে: 'আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ। আসসালামু আলাইকা ইয়া খীরাতাল্লাহি মিন খালকিহী। আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদাল মুরসালীন। ওয়া ইমামাল মুত্তাকীন। আশহাদু আন্নাকা ক্বাদ বাল্লাগতার রিসালাহ। ওয়া আদ্দাইতাল আমানাহ। ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ। ওয়া জাহাদতা ফিল্লাহি হাক্কা জিহাদিহী'। এটুকু বাড়িয়ে বললে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এগুলো সব রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গুণাবলী।

তবে প্রথমোক্ত সংক্ষিপ্ত সালামের ওপর সীমাবদ্ধ থাকা উত্তম। এটা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। এব্যাপারে সামনে কথা আসবে।

২- অতঃপর আরেকটু সামনে এগিয়ে যাবেন। এতে আবু বকর (রা.) এর কবর সামনে চলে আসবে। তখন বলবেন, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বকর'! যদি যথোপযুক্ত আরও কিছু শব্দ সালামে যোগ করা হয় তাতে অসুবিধা নেই। যথা: 'আসসালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহি ফী উম্মাতিহী। রাযিয়াল্লাহু আনকা। ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরান'।

তবে প্রথমোক্ত সংক্ষিপ্ত সালামের ওপর সীমাবদ্ধ থাকা উত্তম। এটা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যেমনটা সামনে আসবে।

৩- অতঃপর আরও একটু সামনে অগ্রসর হবেন। এতে উমর (রা.) এর কবর বরাবর সামনে চলে আসবে। তখন বলবেন, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া উমর'। চাইলে যথোপযুক্ত আরও কিছু শব্দ সালামে যোগ করতে পারেন। তাতে অসুবিধা নেই। যেমন: 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন। রাযিয়াল্লাহু আনকা ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরান'।

---

(১) সুনানে কুবরা, নাসায়ী (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ) (৯৮৪০)। এটাকে তিনি মারফূ' (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য) হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। তথাপি এটা রাসূলুল্লাহর বক্তব্য নয়; বরং কা'বের বক্তব্য- এই মত প্রাধান্য দিয়েছেন।

(২) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (১/২৯৮) (৬/৯৭)

(৩) বুখারী (৪৪৪)। মুসলিম (৭১৪)

(৪) বুখারী (১১৯৬)। মুসলিম (১৩৯১)

তবে প্রথমোক্ত সংক্ষিপ্ত সালামের ওপর সীমাবদ্ধ থাকা উত্তম। এটা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর আমল।

নাফে' থেকে বর্ণিত, ইবনে উমর (রা.) যখন সফর থেকে আসতেন মসজিদে (নববীতে) ঢুকে কবরের সামনে আসতেন। অতঃপর বলতেন, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাতাহ'(১)।

আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি, আবু বকর ও উমর (রা.) এর প্রতি সালাম পেশ করতে দেখেছি'(২)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের ওপর সালাম পেশ করার উদ্দেশে দাঁড়ানোর সময় শরঈ আদব ও শিষ্টাচারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আবশ্যক। ফলে অত্যন্ত আদব ও ইহতিরামের সঙ্গে, অবনত কণ্ঠে সালাম পেশ করবেন। উপরন্তু মসজিদে এমনিতেই আওয়াজ উঁচু করা নিষিদ্ধ। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা নুড়ি ছুঁড়ে মারলো। তাকিয়ে দেখলাম, তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তিনি বললেন, যাও ঐ লোক দুজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাদের নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, তোমরা কারা? অথবা বললেন, তোমরা কোন্ শহর থেকে এসেছো? তারা জানালো, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমরা যদি মদিনার লোক হতে, তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলছো(৩)!

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের কবরের কাছে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা ও লম্বা দুআ করা উচিত নয়। এটাকে ইমাম মালেক ইবনে আনাস মাকরূহ বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'এটা বিদআত। সালাফ এমনটি করেননি। এই উম্মতের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের পথ ছাড়া অন্য কেনো পথে সফল হতে পারবে না'।

একইভাবে ইমাম মালেক ইবনে আনাস মদীনাবাসীদের জন্য প্রত্যেক বার মসজিদে এলেই নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের কাছে আসা অপছন্দ করতেন। কারণ সালাফে সালেহীন এমনটা করতেন না। তারা মসজিদে আসতেন। আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.) প্রমুখের পেছনে সালাত আদায় করতেন। সালাতের মাঝেই তারা বলতেন, 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবী ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ'। অতঃপর সালাত শেষ করে তারা হয়তো বসতেন অথবা বের হয়ে যেতেন। সালাম দেয়ার জন্য কবরের কাছে আসতেন না। কারণ তারা জানতেন, নবীজীর ওপর সালাতের মাঝে সালাম পাঠই সর্বোত্তম ও সবচেয়ে পরিপূর্ণ পন্থা।

এভাবে প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে কিছু না চাওয়া। রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না ডাকা। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করা। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে মদদ বা প্রয়োজন পূরণের দাবি পেশ না করা। মসজিদে নববী হোক কিংবা অন্যত্র হোক সর্বক্ষেত্রে এই বিধান এক ও অভিন্ন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾﴾ অর্থ: 'তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে'। [গাফের: ৬০] আরও বলেন, ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِي وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾﴾ অর্থ: 'আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যখন কেউ আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস

(১) 'ফাজলুস সালাতি আলান নাবী', ইসমাঈল জাহযামী (১০০)

(২) মুয়াত্তা মালেক (১/১৬৬)। 'ফাজলুস সালাতি আলান নাবী', ইসমাঈল জাহযামী (৯৮)

(৩) বুখারী (৪৭০)

করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে'। [বাকারা: ১৮৬] আরও বলেন, ﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٥٥﴾ অর্থ: 'তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না'। [আ'রাফ: ৫৫] অন্যত্র বলেন, ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ অর্থ: 'আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই করতে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল'। [আনআম: ১৬২-১৬৩] আরও বলেন, ﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾ অর্থ: 'আর আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে তুমি ডেকো না যে তোমার ভালো বা মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ করো, তাহলে তখন তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'। [ইউনুস: ১০৬] আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন উম্মতকে জানিয়ে দেন যে, তিনি নিজের জন্যও উপকার বা ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨﴾ অর্থ: 'আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য'। [আ'রাফা: ১৮৮] অন্যত্র আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন উম্মতকে জানিয়ে দেন যে, তিনি তাদের জন্যও উপকার বা ক্ষতির সামর্থ্য রাখেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَدۡعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٠ قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١﴾ অর্থ: 'বলুন: আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বলুন: আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার কিংবা সুপথে আনয়ন করার মালিক নই'। [জ্বিন: ২০-২১]

সালাম পেশ করার সময় হুজরার দেয়াল স্পর্শ করা, তাতে চুম্বন করা, সেখানে সিজদা দেয়া এগুলোর কোনোটাই বৈধ নয়।

মদীনার অধিবাসী ও দর্শনার্থীদের জন্য মসজিদে কুবা যিয়ারত ও সেখানে সালাত আদায় করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো হেঁটে কখনো সওয়ার হয়ে মসজিদে কুবাতে যেতেন। অতঃপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করতেন'[১]।

মদীনাতে অবস্থানকালে আরেকটি সুন্নাত আমল হলো বাকী' কবরস্থান যিয়ারত করা। উসমান ইবনে আফফান (রা.) সহ সেখানে শুয়ে থাকা সকল সাহাবাদের ওপর সালাম পেশ করা। একইভাবে সালাম পেশ ও দুআর জন্য উহুদের শহীদদেরকে যিয়ারত করাও সুন্নাত। পাশাপাশি তাদের স্মৃতিচিহ্ন দেখে নিজের ভেতরে ঈমান যিন্দা করা আবশ্যক।

কবর যিয়ারতের সময় কী দুআ পড়তে হবে সেটা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। বুরাইদা ইবনুল হুসাইব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদেরকে কবরস্থানে যাওয়ার দুআ শিখিয়ে দিতেন। তারা বলতেন, 'আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ার মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু লা-লাহিকূন। আসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ'[২]। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাকী' কবরস্থান যিয়ারত করতেন। সেখানে তিনি বলতেন, 'আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিন মুমিনীন। ওয়া আতাকুম মা তূআদূনা গাদান মুআজজালূন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন। আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাকীয়িল গারকাদ'[৩]।

---

(১) বুখারী (১১৯৪)। মুসলিম (১৩৯৯)

(২) মুসলিম (৯৭৫)

(৩) মুসলিম (৯৭৪)

এগুলো কবর যিয়ারতের সুন্নতসম্মত পদ্ধতি। বিপরীতে মৃতকে ডাকা, তাদের কাছে সাহায্য বা শাফায়াত প্রার্থনা, তাদেরকে উসিলা ধরা, কবর তওয়াফ করা, কবরের পাশে অবস্থান অবস্থান (ইতিকাফ) করা- সবকিছু শরীয়তে নিষিদ্ধ, নব আবিষ্কৃত বিষয়। বিদআতী যিয়ারত। বরং এগুলোর কিছু বিষয় তো সরাসরি শিরক। যথা মৃতকে ডাকা, মৃতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদি।

একইভাবে মসজিদে নববী, মসজিদে কুবা এগুলো ব্যতীত বিশেষ কোনো মসজিদ কিংবা স্থানকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে সেটা যিয়ারত করা ও সেখানে সালাত আদায় করা- ভিত্তিহীন কাজ। সেগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব, যিয়ারত কিংবা সেখানে সালাত আদায় উত্তম হবার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই। ফলে এগুলো বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর অনুগ্রহে সমাপ্ত। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবার ও তাঁর সকল সাথীবর্গের ওপর।